প্রশিক্ষণ মডিউল

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

Training Module

Conservation and Culture Management of Indigenous Small Fishes

Department of Fisheries, Bangladesh

প্রশিক্ষণ মডিউল
দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

প্রধান সম্পাদক

সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশনায়ঃ মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ই-বুক প্রণয়ন

মো: ইউসুফ খান
মো: ইকবাল হোসেন

প্রকাশকাল

মে, ২০১৪ খ্রি.

মডিউল প্রণয়ন

মো: গোলজার হোসেন
কাজী ইকবাল আজম
মো: মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
কৃষ্ণেন্দু সাহা
মো: কামরূজ্জামান হোসাইন
মোঃ আলমগীর কবীর

সহযোগিতায়

Training Module

Conservation and Culture Management of Indigenous Small Fishes

Chief Editor

Syed Arif Azad

Director General

Published By

Department of Fisheries.

e-Book produce

Md. Yousuf Khan
Md. Iqbal Hossian

Printing Period

May 2014

Module Formulated By

Md. Goljar Hossian
Kazi Iqbal Azam
Md. Mizanur Rahman Siddique
Kresnendo Saha
Kamruzzman Hossian
Md. Alamgir Kabir

Cooperation By

-------------------------------------.

বিষয়সূচি

ক্র. নং		বিষয়		পৃষ্ঠা
১।		দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের গুরুত্ব ও চাষের সম্ভাবনা		
২।		দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের সাধারণ পরিচিতি		
৩।		দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের জীববিদ্যা		
৪।		দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের জীববৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ কৌশল		
৫।		দেশীয় জাতের ছোট মাছ সংরক্ষণে অভয়াশ্রমের ভূমিকা		
৬।		ছোট মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল		
৭।		ছোট মাছের পোনা সংগ্রহ, পরিবহন ও শোধন		
৮।		মলা ও পুঁটির চাষ ব্যবস্থাপনা		
৯।		রুই জাতীয় মাছের সাথে বাটার মিশ্রচাষ		
১০।		ধান ক্ষেতে ছোট মাছের চাষ		
১১।		কৈ, শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা (সেশন-১)		
১২		কৈ, শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা (সেশন-২)		
১৩।		পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা		
১৪।		ছোট মাছ আহরণ, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ		
১৫।		গ্রন্থপঞ্জি		

Contents

Sl.	Subject	Page
1.	Importance and Prospects of Small Indigenous Species (SIS)	
2.	Introduction to Indigenous Small Fishes	
3.	Biology of Culturable Indigenous Small Fishes	
4.	Biodiversity and Conservation Techniques of SIS	
5.	Role of Fish Sanctuary in SIS Conservation	
6.	Breeding Techniques and Fry Production of SIS	
7.	Collection, Transportation and Disinfectations of SIS Fry	
8.	Culture Management of Mola and Punti	
9.	Polyculture of Bata with Major Carps	
10.	Culture of SIS in Paddy Field	
11.	Culture Management of Koi, Shing and Magur (Session-1)	
12.	Culture Management of Koi, Shing and Magur (Session-1)	
13.	Culture Management of Pabda and Golsha	
14.	Harvesting, Marketing and Processing of SIS	
15.	References	

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের গুরুত্ব ও চাষের সম্ভাবনা

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ প্রানিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও জীবিকা নির্বাহে দেশীয় প্রজাতির মাছর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এদেশে রয়েছে অংসখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘী, হাওর-বাঁওড়, বিল ও প্লাবনভূমি যা মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও চাষের জন্য খুবই উপযোগি। আমাদের দেশে রয়েছে ১.০৩ মিলিয়ন হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রায় ২৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নদী ও মোহনা, ১১৪ হাজার হেক্টর বিল, ৬৮ হাজার হেক্টর আয়তনের কাপ্তাই লেক, ৫ হাজার হেক্টর জলায়তনের বাঁওড় বা মরা নদী, প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর আয়তনের সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চল এবং ২৮.৩ লক্ষ হেক্টর আয়তনের প্লাবনভূমি। অতীতে এই বিশাল জলাভূমি প্রাকৃতিক ভাবেই মৎস্য সম্পদে ভরপুর ছিল । ষাট ও সত্তর দশকে এদেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ আসতো এসব জলাভূমি থেকে। আহরিত মাছের যেমন ছিল প্রাচুর্যতা তেমনই ছিল তার প্রজাতি বৈচিত্র্য। দেশে মিঠা পানির মাছের প্রজাতির সংখ্যা ২৬০ এবং চিংড়ির প্রজাতির সংখ্যা ২৪। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলেরই দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অন্যতম উপাদান ছিল দেশীয় ছোট প্রজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ এসব মাছ। সে সময় আমিষের উৎস হিসেবে দুধ, ডিম বা মাংস এত সহজলভ্য ছিল না, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আমিষের প্রধান উপাদানই ছিল এ ছোট প্রজাতির দেশীয় মাছ।

দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের প্রাচুর্যতা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টিহীনতার জন্য দেশীয় ছোট মাছের অপ্রাপ্যতা অনেকাংশেই দায়ী। পাশাপাশি গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সর্বত্রই এসব মাছের ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। অন্যদিকে ছোট মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয়ের উৎসও আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। এসব ছোট মাছের মধ্যে ৫০টি প্রজাতি সচরাচর অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে পাওয়া যায়; যার উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রমেই সংকটাপন্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ এ সকল দেশীয় প্রজাতির মাছের পুষ্টিগুণ ও বাজার মূল্য অনেক বেশি। দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে (২৩.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন) প্রায় ১১ শতাংশ আসে বিদেশী প্রজাতির মাছ থেকে। স্থানীয় রুই জাতীয় মাছ থেকে আসে প্রায় ২২ শতাংশ এবং ---শতাংশের বেশি আসে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ থেকে। পসিংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় উৎপাদিত মাছের সিংহভাগই (প্রায় ৯০ শতাংশ) দেশীয় প্রজাতির মিঠাপানির মাছ। তাই মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় দেশীয় প্রজাতির মাছ সকল বিবেচনায় অগ্রাধিকারযোগ্য।

বিগত দু’দশক ধরে বাজারে ছোট মাছের অভাব দেখা যাচ্ছে। প্রাকৃতিক জলাশয়েও আগের মতো দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ আর দেখা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন, অধিক আহরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ, জলাশয় ভরাট, মাছের ক্ষত রোগ, কৃষি জমিতে সার ও কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে এদেশের জনপ্রিয় ছোট মাছগুলো মারাত্মক হুমকির মুখে। বিগত দশকে ভাবা হতো ছোট মাছ বড় মাছের মতো বাড়ন্ত নয় ও তাদের প্রতিযোগী; ছোট মাছের বাজার দরও ছিল কম। এসব কারণে মাছ চাষিরা রুইজাতীয় মাছের সাথে দেশীয় ছোট মাছ পুকুরে চাষ করতে হবে একথা চিন্তাই করত না। বরং পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে এদের সমূলে বিনাশ করে ফেলতো। দরিদ্র মাছ চাষিরা তাদের পুকুরে রুইজাতীয় মাছের চাষ ঠিকই করছে, কিন্তু তারা পরিবারের পুষ্টির প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে মাছ বিক্রি করে অর্থ উপার্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তাতে করে মাছ চাষ করেও তাদের পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিহীনতা থেকেই যাচ্ছে। এ বাস্তবতার নিরিখে দরিদ্র মানুষের নগদ অর্থ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে রুইজাতীয় মাছের সংগে ছোট মাছের মিশ্রচাষের বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এভাবে চাষের মাধ্যমে কিছু মাছকেও যদি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় তাহলে তা মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষায়ও সহায়ক হবে।

দেশীয় ছোট মাছের পুষ্টিগত গুরূত্ব

বাংলাদেশের অধিকাংশ গরীব মানুষ কোন না কোন পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। প্রতি বছর ৩০ হাজারের অধিক শিশু Vitamin-A এর অভাবে রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। গ্রামের মানুষের ৫৭% প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ এর

অভাবে, ৮৯% আয়রনের অভাবে, ৮০% ক্যালসিয়ামের অভাবে এবং ৫৩% রক্তশূন্যতায় ভুগছে। দেশীয় ছোট মাছ বিশেষ করে মলা, পুঁটি, ঢেলা ইত্যাদি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ বিধায় রাতকানা, রক্তশূন্যতাসহ অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোট মাছের কাঁটা ও মাথার অংশে এবং মাংসপেশীতে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও জিংক থাকে যা শিশুদের হাড় গঠনে খুবই প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে মলা মাছের ক্যালসিয়াম দুধের সাথে তুলনীয়। গরীব মানুষ সহজে শাক-শবজীর সাথে ছোট মাছ রান্না করে পরিবারের সকলে মিলে খেয়ে পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে।

সারা বিশ্বে সহজপাচ্য উন্নতমানের প্রাণিজ আমিষ হিসাবে মাছের অবস্থান সর্বাগ্রে। ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণ আমিষ এবং মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ১০টি Amino acid আছে। মাছের আমিষ রক্তে কলেস্টারোলের মাত্রা কমায়। মাছের দেহের ওমেগা-৩ Fatty acid রক্তের অনুচক্রিকাকে জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয় এবং ফুসফুসের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। মাছের তেল কিডনীতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়। মাছে কম-বেশি ৭২% পানি, ১৯% আমিষ, ৮% চর্বি, ০.১৫% ক্যালসিয়াম, ০.২৫% ফসফরাস এবং ০.১০%Vitamin-A, B, C, D আছে। অনেকক্ষেত্রে বড় মাছের তুলনায় ছোট মাছের পুষ্টিমান বেশি হয়ে থাকে। ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ও আয়োডিনের মত খনিজ পদার্থ, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে সহায়ক। ফসফরাস নতুন কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে। লাইসিন ও সালফার সমৃদ্ধ অত্যাবশ্যকীয় Amino acid ছোট মাছে বেশি পরিমাণে থাকে। অন্ধত্ব, গলগন্ড ও রক্তশূন্যতা দূরীকরণে ছোট মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণে Amino acid থাকে, যা শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধ মানুষের চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধিসহ রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। এ ছাড়া গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের রক্তশূন্যতা থেকে রক্ষায় ছোট মাছ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখে। গর্ববতী মহিলাদের ছোট মাছ খাওয়ালে বাচ্চার মস্তিষ্ক, ত্বক, চোখের গঠন এবং হাড় ও দাঁতের গঠন সঠিক ও স্বাভাবিক হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ যেভাবে মাছ কাটা ও ধোয়া হয় তাতে মাছে বিদ্যমান অনেক পুষ্টি ধুয়ে চলে যায়। মলা মাছের দেহের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মলা মাছে বিদ্যমান মোট Vitamin-A এর পরিমাণ চোখের অংশে সবচেয়ে বেশি (৫৩%), পেটের অংশে ৩৯%, শরীরের সামনের অংশে ৭% এবং লেজের অংশে ১% থাকে। মাছ কাটার সময় মাথা কেটে ফেলে দিলে মাছে বিদ্যমান ভিটামিনের বেশির ভাগই ফেলে দেয়া হয়। সেজন্য মাছ কাটার সময় বা ধোয়ার সময় এসব বিষয়ে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

সারণি-১. কতিপয় ছোট ও বড় মাছের পুষ্টিগুণ তুলনামুলক চিত্র (প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশ)

মাছের প্রজাতি		আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	লৌহ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস (গ্রাম)	ভিটামিন (মাইক্রো গ্রাম)
ছোট মাছ	পুঁটি	১৮.৯	২.৪	৩.১	০.৯৬	১.০৬	০.৯৫	৩৭.০০
	মলা	১৫.৮	৪.১	১৫.০	০.০০৭	১.০৭১	-	১৯৬০
	মাগুর	১৫.০	১.০	৪.২	০.৭০	০.১৭২	০.৩০	-
	কৈ	১৪.৮	৮.৮	৪.৪	১.৩৫	০.৪১	০.৩৯	৩২

	শিং	২২.৮	০.৬	৬.৯	০.২৬	০.৬৭	০.৬৫	-
	পাবদা	১৯.২	২.১	৪.৬	১.৩	০.৩১	০.২১	-
	টেংরা	১৯.২	৬.৫	১.১	০.৩০	০.২৭	০.১৭	
	ফলি	১৯.৮	১.০	-	০.১৬	০.৫৯	০.৪৫	-
	সরপুটি	১৫.৫	৯.৫	-	০.৫৪	০.২২	০.১২	-
	খলিসা	১৬.১	৩.৯	৩.১	০.৯	০.৪৬	০.৩৬	
	ঢেলা	১৬.৩	-	-	-	১.২৬	-	৯৩৭
বড় মাছ	রুই	১৬.৬	১.৪	৪.৪	০.০০০৯	০.৬৮	০.১৫	-
	কাতল	১৯.৫	২.৪	৩.০	০.০০০৯	০.৫৩	০.২১	-
	মৃগেল	১৯.৫	০.৮	৩.৩	০.৯	০.৩৫	০.২৮	-
	কালিবাউস	১৪.৭	১.০	-	০.৩৩	০.৩২	০.৩৮	-
	বোয়াল	১৫.৪	২.৭	-	০.৬২	০.১৬	০.৪৯	-
	চিতল	১৮.৬	২.৩২	-	২.৯৮	০.১৮	০.২৫	-
	পাংগাস	১৪.২	১০.৮	-	০.০০০৫	০.১৮	০.১৩	-
	সিলভারকার্প	১৬.৩	-	-	০.০০৩	০.২৬৮	-	১৭

ছোট মাছ চাষের সুবিধাবলী

- অধিকাংশ ছোট মাছই প্রাকৃতিকভাবে বছরে একাধিকবার প্রজনন করে থাকে। তাই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না;
- ছোট মাছ কম সময়েই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ফলে বংশবৃদ্ধিতে সুবিধা হয়;
- ছোট মাছ খুব অল্প সময়েই খাওয়া বা বাজারজাতকরণের উপযোগি হয়;
- ছোট মাছ প্রায় সব ধরণের জলাশয়ে চাষ করা যায়, রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষও করা যায়;
- অনেক ছোট মাছ বিশেষ করে জিওল মাছ কম অক্সিজেন ও বেশি তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে;
- চাষকালীন সময়ে ছোট মাছ অনবরত আহরণ ও মজুদ করা যায়;
- ছোট মাছ বাজারে যেকোন আকারেই বিক্রয়যোগ্য হয়ে থাকে;
- অন্যান্য মাছের তুলনায় ছোট মাছের চাহিদা ও বাজার মূল্য অনেক বেশি;
- এ সকল মাছে কম রোগ হয় ও এরা বিস্তৃত পরিবেশ সহনশীল;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এ সকল মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে;
- কোন কোন ছোট মাছের (কৈ, শিং ও মাগুর) বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপক চাষ সম্ভাবনা রয়েছে;
- ছোট মাছ ওজনের অনুপাতে সংখ্যায় বেশি হয় বলে পরিবারের সদস্যদের মাঝে বন্টনে সুবিধা হয়;
- ছোট মাছ চাষ করে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

উপসংহারঃ

ছোট মাছ মজুদের দুই-তিন মাস পর থেকে নিয়মিত বিরতিতে মাছ ধরে পরিবারের প্রয়োজনীয় মাছের চাহিদা পূরণ এবং অতিরিক্ত মাছ বাজারে বিক্রি করা যায়। অনেক সময় বড় মাছের তুলনায় বাজারে ছোট মাছের দাম বেশি পাওয়া যায়। ফলে চাষি অর্থনৈতিকভাবে অধিক লাভবান হয়। দেশীয় ছোট মাছগুলোর মধ্যে মলা, ঢেলা, পাবদা, পুঁটি, চাপিলা, কৈ, শিং, মাগুর, খলিশা, টেংরা, গুলশা, মেনি ইত্যাদি খুবই সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয়। অপূর্ব স্বাদ, পুষ্টিগুণ ও উচ্চ বাজারমূল্য বিবেচনায় এসব মাছকে বাঁচাতে হবে এবং এদের চাষ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষার

জন্য কেবল সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা নিলেই যথেষ্ট হবে না, কিভাবে অন্য প্রজাতির সাথে বাণিজ্যিক ভাবে চাষের (Commercial Culture) অধীনে নেয়া যায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই প্রকৃতপক্ষে এ সব মাছ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। সর্বোপরি দেশীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত ঐতিহ্যসমূহকে টিকিয়ে রাখাসহ এদেশের জীববৈচিত্র্য উন্নয়নের জন্য দেশীয় ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের সাধারণ পরিচিতি ও জীববিদ্যা

ছোট মাছের সাধারণ পরিচিতি

আকারগত দিক থেকে মাছ সাধারণত দু’প্রকার- বড় মাছ ও ছোট মাছ। ষাট ও সত্তর দশকে প্রাকৃতিক জলাশয়ে ছোট-বড় উভয় মাছেরই প্রাচুর্যতা ছিল এবং মোট উৎপাদিত মাছের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি আসতো প্রাকৃতিক জলাশয় হতে। কিন্তু দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগে নেমে এসেছে। রুই জাতীয় মাছের চাষাবাদ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য রুই জাতীয় মাছের পাশাপাশি অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ ছোট মাছের চাষ সম্প্রসারণ ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। এ জন্য ছোট মাছের সংগে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ছোট মাছের সংজ্ঞা নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। তবে নববই দশকে ছোট মাছ নিয়ে কতিপয় গবেষণায় ২৫ সেমি. পর্যন্ত আকারের মাছ গুলোকে ছোট মাছ হিসাবে অভিহিত করা হয়। এখন পর্যন্ত এটাই ছোট মাছের গ্রহণ যোগ্য পরিচিতি। ইংরেজিতে ছোট মাছ Small Indigenous Species (SIS) নামে পরিচিত। বাংলাদেশসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অনেক গবেষক ছোট শ্রেণীর মাছকে Self Recruiting Species (SRS) নামেও অভিহিত করে থাকেন। এদেশে প্রাপ্য স্বাদু পানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে অধিকাংশই ছোট মাছ শ্রেণীভুক্ত বলে ধারণা করা হয়। যদিও সঠিক সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। ড. ইউসুফ আলী (Felts *et al.* 1997) তাঁর এক প্রবন্ধে মোহনা থেকে নদীতে অভিপ্রয়াণকারী মাছসহ ছোট মাছের ১৪৩ প্রজাতি উল্লেখ করেছেন। তবে প্রায় ৫০ প্রজাতির ছোট মাছ সচরাচর আভ্যন্তরীন জলাশয়ে পাওয়া যায়। ছোট মাছসমূহের একটি তালিকা টেবিল- ২ দেয়া হলো।

টেবিল-২ ছোট মাছের তালিকা

ক্রমিক	বাংলা/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ছবি
১.	ফুল চেলা	*Salmostoma phulo*	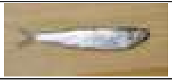
২.	ছ্যাপ চেলা	*Chela cachius*	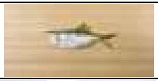
৩.	কাশ খয়রা	*Chela laubuca*	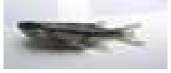
৪.	ঘোড়া চেলা	*Oxygaster gora*	
৫.	চেলা	*Salmostoma argentea*	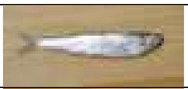
৬.	নারিকেল চেলা	*Salmostoma bacaila*	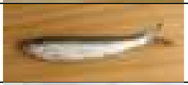
৭.	দাড়কিনা	*Esomus danricus*	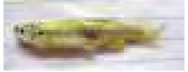
৮.	দাড়কিনা	*Rasbora rasbora*	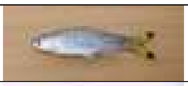
৯.	দাড়কিনা	*Rasbora daniconius*	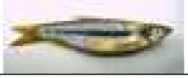
১০.	এলং	*Rasbora elanga*	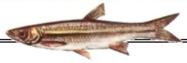

ক্রমিক	বাংলা/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ছবি
১১.	ভোল	*Barilius bola*	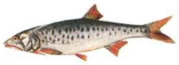
১২.	খোকশা	*Barilius shacra*	
১৩.	বানি খোকশা	*Barilius barna*	
১৪.	পাথর চাটা	*Barilius telio*	
১৫.	বড়ালি	*Barilius barila*	
১৬.	জয়া, কোকশা	*Barilius bendilisis* var. *chedra*	
১৭.	জয়া	*Aspidopataria jaya*	
১৮.	মড়ারি	*Aspidopataria morar*	
১৯.	কোকশা	*Barilius bendilisis* var. *cosca*	
২০.	খোকশা	*Barilius vagra*	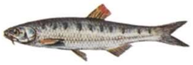
২১.	বাঁশপাতা	*Danio devario*	
২২.	অনজু	*Danio rerio*	
২৩.	ছিবলি	*Danio aequipinnatus*	
২৪.	নিপাতি	*Danio dangila*	
২৫.	মলা	*Ambylpharyngodon microlepis*	
২৬.	মলা	*Ambylpharyngodon mola*	
২৭.	ঢেলা	*Osteobrama cotio cotio*	
২৮.	জরুয়া	*Chagunius chagunio*	
২৯.	জরুয়া	*Osteochilus neilli*	
৩০.	জরুয়া	*Labeo boggut*	

ক্রমিক	বাংলা/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ছবি
৩১.	এনগ্রট	*Labeo angra*	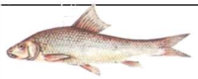
৩২.	ঘোড়ামুইখা	*Labeo pangusia*	
৩৩.	খুরশা	*Labeo dero*	
৩৪.	বনরুই	*Labeo* sp.	
৩৫.	সরপুঁটি	*Puntius sarana*	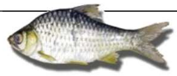
৩৬.	চোলা পুঁটি	*Puntius chola*	
৩৭.	মলা পুঁটি		
৩৮.	ফুটানি পুটি	*Puntius phutunio*	
৩৯.	ঝিলি পুঁটি	*Puntius gelius*	
৪০.	টেরি পুঁটি	*Puntius terio*	
৪১.	কাঞ্চন পুঁটি	*Puntius cosuatis*	
৪২.	তিত পুঁটি	*Puntius ticto*	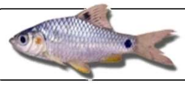
৪৩.	জাত পুঁটি	*Puntius sophore*	
৪৪.	কুশাটি	*Puntius carnatieus*	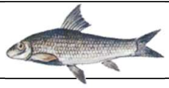
৪৫.	কালা বাটা	*Crossocheilus latius*	
৪৬.	ঘর পোয়া	*Garra gotyla*	
৪৭.	পোয়া	*Garra annandalei*	
৪৮.	বালি চাটা	*Nemachilus zonalternans*	
৪৯.	বালি চাটা	*Nemachilus botia*	
৫০.	করিকা	*Nemachilus corica*	
৫১.	ঢরি	*Nemachilus zonatus*	
৫২.	ঢরি	*Nemachilus beavani*	

ক্রমিক	বাংলা/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ছবি
৫৩.	ঢরি	*Nemachilus sikmaiensis*	
৫৪.	খরকা	*Nemachilus* spp.	
৫৫.	শোওন খরকা	*Nemachilus savana*	
৫৬.	পানগা	*Acnthopthalmus pangia*	
৫৭.	মাগুর	*Clarias batrachus*	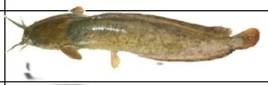
৫৮.	বোয়ালি পাবদা	*Ompok bimaculatus*	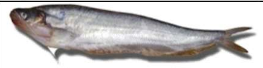
৫৯.	মধু পাবদা	*Ompok pabda*	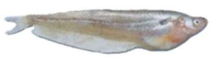
৬০.	ছোট পাবদা	*Ompok pabo*	
৬১.	শিং	*Heteropneustes fossilis*	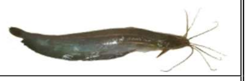
৬২.	শিং	*Olyra kempi*	
৬৩.	চ্যাগা	*Checa checa*	
৬৪.	কাজলি	*Ailia coila*	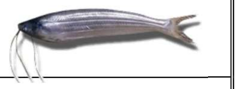
৬৫.	কাজলি	*Ailiichthys Punctata*	
৬৬.	বাতাশি	*Pseudeutropius atherinoides*	
৬৭.	বাচা	*Eutropichthys vacha*	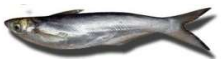
৬৮.	ঘাওড়া	*Chandramara chandramara*	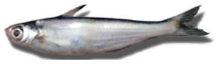
৬৯.	ঘাওড়া	*Amblyceps* spp.	
৭০.	ঘাওড়া	*Amblyceps mangois*	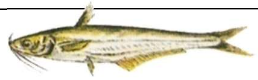
৭১.	ঘাওড়া	*Clupisoma garua*	
৭২.	মুড়ি বাচা	*Clupisoma murius*	
৭৩.	টেংরা	*Batasio batasio*	

ক্রমিক	বাংলা/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ছবি
৭৪.	টেংরা	*Batasio tengana*	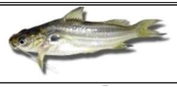
৭৫.	গুলশা	*Mystus cavasius*	
৭৬.	গুলশা	*Mystus bleekeri*	
৭৭.	বুজুরি টেংরা	*Mystus tengra*	
৭৮.	টেংরা	*Mystus vittatus*	
৭৯.	নুনা টেংরা	*Mystus gulio*	
৮০.	নুনা টেংরা	*Glyptolhorax horai*	
৮১.	টেংরা	*Mystus armatus*	
৮২.	গাং টেংরা	*Gagato nangra*	
৮৩.	গাং টেংরা	*Gagata gagata*	
৮৪.	গাং টেংরা	*Gagata viridescens*	
৮৫.	গাং টেংরা	*Gagata youssoufi*	
৮৬.	কাওয়া জংগি	*Gagato cenia*	
৮৭.	কুটা কান্তি	*Erethistes pussilus*	
৮৮.	কুটা কান্তি	*Hara jerdoni*	
৮৯.	কুটা কান্তি	*Hara hara*	
৯০.	কেচি	*Corica soborna*	
৯১.	কুচিয়া	*Monopterus cuchia*	
৯২.	অর্ধ ঠোঁটা	*Hyporhamphus gimardu*	
৯৩.	সিসর	*Sisor rhabdophorus*	
৯৪.	সিসর	*Conta conta*	
৯৫.	টেলিচিটা	*Glytothorax shawi*	

ক্রমিক	বাংলা/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ছবি
৯৬.	টেলিচিটা	*Glytothorax telchitta*	
৯৭.	টেলিচিটা	*Glytothorax* spp.	
৯৮.	টাকি, লাটা	*Channa punctatus*	
৯৯.	চ্যাং	*Channa orientalis*	
১০০.	কাকিলা	*Xenentodon cancila*	
১০১.	কাকিলা	*Hyporhamphus gimardi*	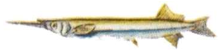
১০২.	এক ঠোঁটা	*Zenarchopterous ectuntio*	
১০৩.	এক ঠোঁটা	*Dermogenys pussilus*	
১০৪.	টিটারি	*Psilorhynchus sucatio*	
১০৫.	বানপোনা	*Aplocheilus panchax*	
১০৬.	বানপোনা	*Oryzias melastigma*	
১০৭.	বালি টোরা	*Psilorhynchus balitora*	
১০৮.	বালি টোরা	*Psilorhynchus gracilis*	
১০৯.	কুমিরের খিল	*Microphis deocata*	
১১০.	কুমিরের খিল	*Doryichthys chokderi*	
১১১.	কুমিরের খিল	*Doryichthys cancalus*	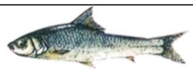
১১২.	বাটা	*Labeo bata*	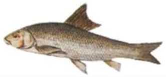
১১৩.	ভাঙ্গান বাটা	*Labeo boga*	
১১৪.	ভাংনা, টাটকিনি	*Cirrhinus reba*	
১১৫.	পাহাড়ি গুতুম	*Somileptes gongota*	
১১৬.	রাণী/ বৌমাছ	*Botio dario*	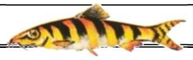

ক্রমিক	বাংলা/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ছবি
১১৭.	রাণী/পুতুল	*Botio Lohachata*	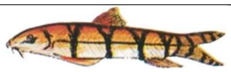
১১৮.	গুতুম	*Lepidocephalus guntea*	
১১৯.	গুতুম	*Lepidocephalus annandalei*	
১২০.	পুইয়া	*Lepidocephalus irrorata*	
১২১.	পুইয়া	*Lepidocephalus berdmorei*	
১২২.	পুইয়া	*Neoecirrhicthys maydelli*	
১২৩.	চাপিলা	*Gudusia chapra*	
১২৪.	গণি চাপিলা	*Gonialosa manminna*	
১২৫.	তারা বাইম	*Macrognathus aculeatus*	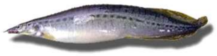
১২৬.	গুচি বাইম	*Mastacembelus pjnancalus*	
১২৭.	খরশুলা	*Rhinomugil corsula*	
১২৮.	কেচি	*Mugil cascasia*	
১২৯.	চুনা খলিশা	*Colisa sota*	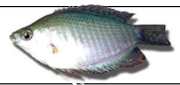
১৩০.	খলিশা	*Colisa fasciatus*	
১৩১.	লাল খলিশা	*Colisa lalius*	
১৩২.	বইচা খলিশা	*Colisa labiosa*	
১৩৩.			
১৩৪.	নেফতানি	*Ctenops nobilis*	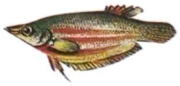
১৩৫.	নেফতানি	*Macropodus cupanus*	
১৩৬.	কৈ	*Anabas testudineus*	
১৩৭.	বেলে	*Glososogobius giuris*	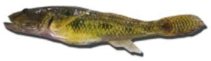

ক্রমিক	বাংলা/স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ছবি
১৩৮.	নুনা বেলে	*Brachygobius nunus*	
১৩৯.	নাফিত	*Badis badis*	
১৪০.	মেনি/ভেদা	*Nandus nandus*	
১৪১.	নামা চান্দা	*Chanda nama*	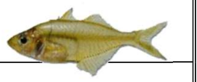
১৪২.	রাঙ্গা চান্দা	*Pseudembassis ranga*	
১৪৩.	কাঁটা চান্দা	*Chanda beculis*	
১৪৪.	তিন চোখা	*Aplocheilus panchax*	

উৎসঃ Felts *et al.* 1997 এবং হক ২০০৪

চাষযোগ্য দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের জীববিদ্যা

ছোট মাছ পুষ্টিমানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সব মাছই চাষ যোগ্য নয়। চাষযোগ্য হবে কিনা ব্যাপারে আরো গবেষনা প্রযোজন। চাষযোগ্য কতিপয় দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের জীববিদ্যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মলা মাছের জীববিদ্যা (Biology of Mola fish)

মলা মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
Class- Osteichthyes
Order- Cypriniformes
Family- Cyprinidae
Genus- ***Amblypharyngodon***
Species- ***A. mola***

স্থানীয় নামঃ মলা
ইংরেজী নামঃ Mola carplet

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

মলা মাছের দেহ কিছুটা চাপা। মুখ গহবরে উপরের ঠোঁট নেই। পৃষ্ঠ ও পায়ু পাখনাতে গাঢ় দাগ দেখা যায়। শিরদাঁড়া বরাবর উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের দাগ কানকোর পিছন হতে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত। লেজ স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত। মলা সাধারণত ৯ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। মলাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে যা শিশুদের অন্ধত্ব ও রাতকানা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। এ ছাড়া সম্পূর্ণ মাছ কাঁটাসহ খাওয়া যায় বলে ক্যালসিয়ামের অভাবও দূর হয়। ফলে হাড় ও দাঁতের গঠন ভাল হয়।

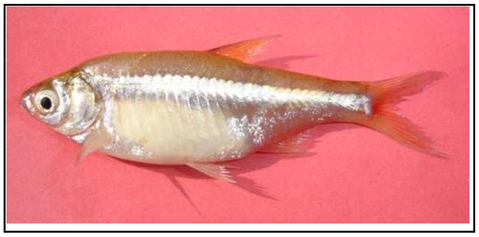

আবাসস্থল

এ মাছ সব ধরণের জলাশয়ে পাওয়া যায়। তবে প্রধানতঃ নদী, প্লাবনভূমি, ধানক্ষেত, বিল, বাঁওড়, খাল এবং পুকুরে পাওয়া যায়। মলা সাধারণত জলাশয়ের উপরি ভাগের উদ্ভিদ এবং প্রাণি প্লাংকটন খায়। রুই জাতীয় মাছের সাথে বা পুঁটির সাথে মিশ্র চাষ করলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

মলা মাছ জলাশয়ের উপরি ভাগের এবং মধ্যস্তরের খাদ্য খায়। পূর্ণ বয়স্ক মলা এককোষী এবং তন্তুজাতীয় শেওলা, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্লাংকটন, প্রোটেয়াজেয়া, ডেব্রিজ, উদ্ভিদাংশ খেয়ে থাকে।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

মলার প্রজনন কাল মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। এরা বছরে দু’বার প্রজনন করে। তবে প্রজননের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় আগষ্ট মাস। গড়ে ডিম ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪০০০টি।

ঢেলা মাছের জীববিদ্যা (Biology of Dhela fish)

ঢেলা মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
  Class- Osteichthyes
    Order- Cypriniformes
      Family- Cyprinidae
        Genus- ***Osteobrama***
          Species- ***O. cotio cotio***

স্থানীয় নাম : ঢেলা
ইংরেজী নাম: -

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

ঢেলা মাছের মুখ ছোট ও ঠোঁট নেই। দেহ চাঁপা, বিশেষ করে বক্ষদেশ (কানকো পাখনার পিছন থেকে পায়ু পাখনা পর্যন্ত) তীক্ষ ভাবে চাপা। দেহের উপরি ভাগে পৃষ্ঠ পাখনার গোড়ায় বেশি গোলাকৃতি কিন্তু নিচের অংশে কিছুটা কম। শিরদাঁড়া রেখা সুস্পষ্ট দেখা যায়। দেহের উপরিভাগের আঁইশ ছোট ফোঁটাসহ রূপালি বর্ণের হয়ে থাকে। পায়ু পাখনা লম্বা। পুচ্ছ পাখনা স্পষ্ট ভাবে দু’ভাগে বিভক্ত। ঢেলা মাছের গড় দৈর্ঘ্য ১১ সেমি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। ধান ক্ষেতে কার্পিও মাছের সাথে ঢেলা মাছ চাষে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়।

ছবিঃ ঢেলা মাছ

আবাসস্থল

এ মাছ সব ধরণের জলাশয়ে বাস করে। তবে প্রধানতঃ নদী, প্লাবনভূমি, বিল, বাঁওড়, খাল এবং পুকুর বেশি পাওয়া যায়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

ঢেলা মাছ সর্বভূক তবে প্রধানতঃ উপরি ভাগের খাদ্য খায়। পূর্ণ বয়স্ক মলা এককোষী এবং তন্তুজাতীয় শেওলা, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্লাঙ্কটন, ডেব্রিজ ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

ঢেলা মাছ বছরে দু’বার প্রজনন করে। এদের প্রজননের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় মে থেকে জুলাই মাস। গড়ে ডিম ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১০৫০ থেকের ৯৩৬০টি।

জাত পুঁটির জীববিদ্যা (Biology of Jat puti)

জাত পুঁটির শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
  Class- Osteichthyes

Order- Cypriniformes
Family- Cyprinidae
Genus- ***Puntius***
Species- ***P. sophore***

জাত পুঁটির স্থানীয় নাম: জাত পুঁটি
ইংরেজী নাম : Spotfin swamp barb

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

পুঁটি মাছের ৭টি প্রজাতির মধ্যে জাত পুঁটি চাষের জন্য উপযোগি। এ মাছের দেহ চাপা ও পিছনের অংশ সরু। দেহের নিম্নভাগ সাদা কিন্তু উপরিভাগ উজ্জ্বল ছাই থেকে সবুজাভ ছাই বর্ণের হয়ে থাকে। মুখ ছোট ও কোন গোঁফ নেই। কানকোর ঠিক পিছনেই পৃষ্ঠ পাখনা ও পৃষ্ঠ পাখনার নিচেই বক্ষ পাখনা অবস্থিত। দেহে দু'টি কালো গোল ফোঁটা আছে, যার একটি কানকোর পিছনে ছোট কালো ফোঁটা অন্যটি বড় কালো ফোঁটা যা পায়ূ পাখনার উপরে থাকে। শিরদাঁড়া রেখা অসম্পূর্ণ। এ পুঁটি গড়ে ৫ সেমি. ও সর্বোচ্চ ১৪ সেমি. হয়ে থাকে। মলাসহ অন্যান্য ছোট মাছ অথবা রুই জাতীয় মাছের সাথে চাষ করে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়।

ছবিঃ জাত পুঁটি

আবাসস্থল

এ মাছ সব ধরণের জলাশয়ে বাস করে। তবে প্রধানতঃ নদী, প্লাবনভূমি, ধান ক্ষেত, বিল, বাঁওড়, খাল এবং পুকুর বেশি পাওয়া যায়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

জাত পুঁটি সাধারণত মধ্যস্তরের খাদ্য খায়। পূর্ণ বয়স্ক জাতপুঁটি প্লাংকটনিক শেওলা, রোটিফার, ক্রাস্টাসিয়ানস্, পোকামাকড়, জলজ আগাছা, পেরিফাইটোন, বালি ও কাঁদাযুক্ত ডেব্রিজ ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

এ মাছের প্রজনন মৌসুম হলো মে থেকে অক্টোবর। ডিম ধারণ ক্ষমতা ৩২৬০ থেকে ৩১২৮০টি।

কৈ মাছের জীববিজ্ঞান (Biology of Koi fish)

কৈ মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
Class- Osteichthyes
Order- Perciformes
Family- Anabantidae
Genus- *Anabas*
Species- *A. testudineus*

সাধারণ/ স্থানীয় নাম: কৈ মাছ
ইংরেজী নাম : Climbing perch

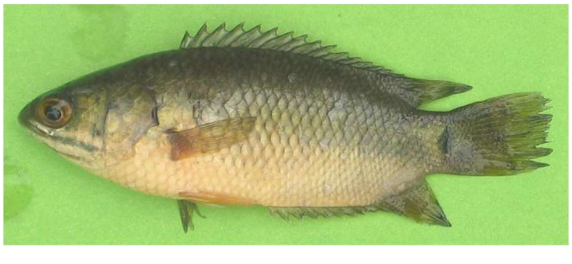

ছবিঃ কৈ মাছ

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কৈ মাছ বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় মাছ হিসেবে পরিচিত। এটি একটি জিওল মাছ অর্থাৎ এরা সামান্য পানিতে দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। এ মাছের মাথা বড় ও প্রায় ত্রিকোণাকৃতি। দেহের বর্ণ কালচে-সবুজ বা বাদামি-সবুজ। মাথাসহ সারাদেহ শক্ত আঁইশ দিয়ে ঢাকা। দু'টো চোয়ালেই দাঁত আছে। পৃষ্ঠ ও বক্ষ পাখনা ধারালো কাঁটাযুক্ত। লেজ অর্ধচন্দ্রাকৃতি। শিরদাঁড়া রেখা দু'ভাগে বিভক্ত। কৈ মাছ কানকো দিয়ে স্থলভাগে চলাচল করতে পারে। কানকোর পিছনে কালো ফোঁটা বিদ্যমান।

দেশী কৈ মাছের পাশাপাশি আরেকটি নতুন জাত থাইল্যান্ড থেকে আনা হয়েছে। যা 'থাই কৈ' নামে পরিচিত। এদের দেহ বর্ণ দেশী কৈ মাছের তুলনায় হালকা ফ্যাকাশে ধরণের এবং দেহের উপরিভাগে ছোট ছোট কালো দাগ থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক অঞ্চলেই সীমিত আকারে 'থাই কৈ' সফলভাবে চাষাবাদ হচ্ছে।

আবাসস্থল

কৈ প্রধানত: মুক্ত জলাশয় বা প্লাবনভূমির মাছ। তবে সাধারণত: খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দিঘী, ডোবা-নালা এবং নিমজ্জিত ধান ক্ষেতেও দেখতে পাওয়া যায়। এ মাছগুলো আড়ালিয়া জাতীয় উদ্ভিদ কলমি, হেলেঞ্চা এবং জলজ অন্যান্য ঝোপ-ঝাড় ও ডাল-পালা অধ্যুষিত জলাশয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে। কৈ মাছ গর্তে নিমজ্জিত গাছের গুড়ির তলায় বা সুড়ঙ্গে বসবাস করে এবং স্রোতহীন আবদ্ধ পানিতে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

কৈ মাছ সাধারণত কীট পতঙ্গভোজী এবং কামড়িয়ে কামড়িয়ে খাবার খায়। জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে এরা বিভিন্ন ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকে। যেমন-

- **রেণু পর্যায়ঃ** আর্টেমিয়া, জু-প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড় ইত্যাদি আকর্ষনীয় খাদ্য।
- **জুভেনাইল পর্যায়ঃ** জু-প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা, টিউবিফিসিড ওয়ার্ম।
- **বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায়ঃ** জলজ পোকা-মাকড়, বেনথোস, টিউবিফিসিড, ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মাছ, ডেট্রিটাস, পচনরত প্রাণিজ দ্রব্যাদি।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

প্রথম বছরেই কৈ মাছ পরিপক্কতা লাভ করে ও বছরে একবার প্রজনন করে। সর্বোচ্চ ১৭ সেমি.লম্বা হয়। কৈ মাছের উপযুক্ত প্রজননকাল এপ্রিল থেকে জুলাই মাস। তবে এরা মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রজনন সম্পন্ন করে থাকে। প্রজনন শুরুর পূর্বে বর্ষার বৃষ্টি নামলেই প্রজননের জন্য এরা মাইগ্রেট করে এরা ধানক্ষেত, ডোবা, পকুর-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি স্থানে চলে যায়। সাধারণত এরা যে জায়গায় থাকে সে জায়গায় প্রজনন করে না। তাই ব্রিডিং মাইগ্রেশনের মাধ্যমে স্থান বদল করে নেয়। অত:পর এরা নতুন স্থানে এসে ঝোঁপ-ঝাড় জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ডিম ছাড়ে ও প্রজনন সম্পন্ন করে থাকে। এদের ডিম ভাসমান। তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ১৮-২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষিক্ত ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। উক্ত বাচ্চা/রেণু পোনার কুসুমথলি ২/৩ দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শেষ হলে আস্তে আস্তে প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে বড় হয়। এদের প্রণোদিত প্রজননও করানো যায়। পুরুষ কৈ মাছের তুলনায় স্ত্রী কৈ মাছ আকারে কিছুটা বড় হয়। একটি ৮০-১০০ গ্রাম ওজনের কৈ মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৬,০০০- ৮,০০০ এর মধ্যে হয়ে থাকে।

শিং মাছের জীববিজ্ঞান (Biology of Shing fish)

শিং মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
Class- Osteichthyes
Order- Siluriformes
Family- Heteropneustidae
Genus- *Heteropneustes*
Species- *H. fossilis*

স্থানীয় নাম : শিং
ইংরেজী নাম : Stinging catfish

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

শিং মাছের দেহ লম্বা, সামনের দিক নলাকার, পিছনের দিক চাঁপা, আঁইশবিহীন এবং মাথার উপরে- নীচে চ্যাপ্টা। দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামী লাল এবং বড় অবস্থায় ধূসর কালচে। মুখে চার জোড়া গোঁফ (Barbel) থাকে। মাথার দু'পাশে বিষাক্ত দু'টি কাঁটা (Spine) আছে। পৃষ্ঠ পাখনা (Dorsal fin) ছোট গোলাকৃতি এবং পায়ু পাখনা (Pelvic fin) বেশ লম্বা, পুচ্ছ পাখনা (Caudal fin) গোলাকৃতি । পিঠের দু'পাশে দু'টি অতিরিক্ত শ্বসনযন্ত্র (Accessory respiratory organ) রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দেশী শিং মাছ একক বা মিশ্র পদ্ধতিতে সব ধরণের জলাশয়ে সফলভাবে চাষ হচ্ছে।

ছবিঃ শিং মাছ

আবাসস্থল

শিং মাছের প্রধান আবাসস্থল খাল, বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাঁওড়, পুকুর, ডোবা- নালা, নিমজ্জিত ধানক্ষেত । এ ছাড়া কর্দমাক্ত তলার মাটিতে, গর্তে নিমজ্জিত গাছের গুড়ির তলায় বা সুড়ঙ্গে এরা বসবাস করতে পছন্দ করে। স্রোতহীন আবদ্ধ পানিতে এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। শিং মাছ আগাছা, দল, কচুরিপানা, পঁচা লতা-পাতা, ডাল-পালা অধ্যূষিত জলাশয়ে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

শিং মাছ সাধারণত সর্বভূক (Omnivorous), জলাশয়ের তলার খাদ্য খেয়ে থাকে। শিং মাছ তাদের জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকে।

- **রেণু পর্যায়ঃ** আর্টেমিয়া এবং জু-প্ল্যাঙ্কটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড় ইত্যাদি আকর্ষনীয় খাদ্য;
- **জুভেনাইল পর্যায়ঃ** জুপ্ল্যাঙ্কটন ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা, টিউবিফিসিড ওয়ার্ম;
- **বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায়ঃ** জলজ পোকা-মাকড়, বেনথোস, টিউবিফিসিড ওয়ার্ম, ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মাছ, ডেট্রিটাস, পচনরত প্রাণিজ দ্রব্যাদি।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

শিং মাছ এক বছরেই পরিপক্কতা লাভ করে এবং প্রজননক্ষম হয়। এরা সাধারণত ২০-৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়। শিং মাছ বছরে একবার প্রজনন করে থাকে। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে অগভীর ঝোঁপ-ঝাড় জাতীয় উদ্ভিদযুক্ত এলাকায় প্রজনন সম্পন্ন করে। তবে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হ্যাচারিতে সীমিত আকারে সফলভাবে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদিত হচ্ছে।

শিং মাছের উপযুক্ত প্রজননকাল মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। তবে জুন- জুলাই মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন সম্পন্ন করে থাকে। স্ত্রী শিং মাছ পুরুষ শিং মাছ অপেক্ষা আকারে বড় হয়ে থাকে। সাধারণত ৪০ থেকে ৭০ গ্রাম ওজনের শিং মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৮,০০০-১০,০০০টি। পরিপক্ক ডিম হালকা সবুজ থেকে তামাটে বর্ণের হয়। নিষিক্ত ডিম আঠালো হয় এবং নিমজ্জিত আগাছা, তৃণ, ডাল-পালা ইত্যাদিতে লেগে থাকে।

মাগুর মাছের জীববিজ্ঞান (Biology of Magur Fish)

মাগুর মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
Class- Osteichthyes
Order- Siluriformes
Family- Claridae
Genus- *Clarias*
Species- *C. batrachus*

স্থানীয় নাম : মাগুর
ইংরেজী নাম: Walking catfish

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

মাগুর আঁইশবিহীন জিওল মাছ। দেহ লালচে বাদামি বা ধূসর কালো। এদের মাথা বেশ চ্যাপ্টা ও মুখ প্রশস্ত। পৃষ্ঠ (Dorsal fin) ও পায়ু পাখনা (Pelvic fin) লম্বা এবং লেজের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। লেজের অংশ চাপা ও গোলাকৃতি। মুখে চার জোড়া গোঁফ (Barbel) আছে। পিঠের দুই পার্শ্বে দুটো অতিরিক্ত শ্বসনযন্ত্র (Accessory respiratory organ) রয়েছে, যার ফলে এরা দীর্ঘক্ষণ পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সীমিত আকারে সফলভাবে দেশী মাগুর মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ হচ্ছে।

ছবিঃ মাগুর মাছ

আবাসস্থল

খাল, বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাঁওড়, পুকুর দিঘী, ডোবা- নালা এবং নিমজ্জিত ধান ক্ষেত মাগুর মাছের প্রধান আবাসস্থল। এরা কাঁদাযুক্ত পানিতে এমনকি কর্দমাক্ত তলার মাটিতে, গর্তে, নিমজ্জিত গাছের গুড়ির তলায় বা সুড়ঙ্গে বসবাস করতে পছন্দ করে। স্রোতহীন আবদ্ধ পানিতে এবং আগাছা, নল- খাগড়া ও কচুরিপানায়, পঁচা ডাল-পালা যুক্ত জলাশয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

মাগুর মাছ সাধারণত সর্বভূক (Omnivorous) এবং জলাশয়ের তলার খাদ্য খেয়ে থাকে। এরা জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকে। এদের খাদ্যাভ্যাস অনেকটা শিং মাছের মতই। যেমন-

- **রেণু পর্যায়ঃ** আর্টেমিয়া এবং জু-প্ল্যাংকটন, ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড় ইত্যাদি;
- **জুভেনাইল পর্যায়ঃ** জুপ্ল্যাংকটন ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা, টিউবিফিসিড ওয়ার্ম;
- **বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায়ঃ** জলজ পোকা-মাকড়, বেনথোস, টিউবিফিসিড ওয়ার্ম, ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মাছ ,ডেট্রিটাস, পচনরত প্রাণিজ দ্রব্যাদি।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

মাগুর মাছ এক বছরের মধ্যেই পরিপক্কতা লাভ করে এবং বছরে একবার প্রজনন করে থাকে। এরা সাধারণত ২০-৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়। একই বয়সের স্ত্রী মাগুর মাছ পুরুষ মাগুর মাছের তুলনায় কিছুটা আকারে বড় হয়। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন সম্পন্ন করে। তবে বর্তমানে সফলভাবে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে সীমিত পর্যায়ে পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। এদের প্রজননকাল মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত। তবে জুন-জুলাই মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন কাল হিসেবে বিবেচিত। প্রজননের সময়ে নুতন পানি আসার সাথে সাথেই এরা মাইগ্রেট করে নিকটবর্তী ধানক্ষেত, প্লাবনভূমিতে আসে এবং সেখানে মাটিতে গোলাকার গর্ত করে তাতে ডিম ছাড়ে। মাগুর মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা দৈহিক ওজনের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত ৮০ থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের মাগুর মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৭,০০০-১০,০০০ টি। মাগুরের পরিপক্ক ডিম হালকা সবুজ থেকে তামাটে বর্ণের হয়ে থাকে। নিষিক্ত ডিম আঠালো এবং গাছের ডাল-পালা ও আগাছায় লেগে থাকে।

পাবদা মাছের জীববিদ্যা (Biology of Pabda fish)

পাবদা মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
Class- Osteichthyes
Order- Cypriniformes
Family- Siluridae
Genus- ***Ompok***
Species- ***O. pabda***

স্থানীয় নাম : পাবদা
ইংরেজী নাম : Butter catfish

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

পাবদা মাছের দেহ আঁইশ বিহীন। মাছটি আকারে চেপ্টা এবং সামনের দিক থেকে পিছনের দিক সরু। দেহের উপরিভাগ ধূসর রূপালি ও পেটের দিক সাদা বর্ণের। মুখ বেশ বড় ও বাঁকানো। মুখে ২ জোড়া গোঁফ আছে। নীচের চোয়াল উপরের চোয়ালের চেয়ে বেশ বড় এবং চোয়ালে দাঁত আছে। পৃষ্ঠ পাখনা ছোট, পায়ু পাখনা বেশ লম্বা, লেজ দু’ভাগে বিভক্ত। শিরদাঁড়া রেখার উপরিভাগে হলুদাভ ডোরা দাগ দেখা যায়। কানকোর পিছনে কালো স্পষ্ট ফোঁটা আছে। এ মাছের দৈর্ঘ্য ১৫-২৫ সেমি. হয়ে থাকে। মে-জুলাই এ মাছের প্রজনন কাল। ডিম ধারণ ক্ষমতা ১১,০০০ থেকে ২০,০০০টি। পাবদা পোকা-মাকড় ও শেওলা খায়। স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছের চেয়ে আকারে বড় হয়।একক বা মিশ্র পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা যায়।

ছবিঃ পাবদা মাছ

আবাসস্থল

বাংলাদেশের সর্বত্র নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, বর্ষায় প্লাবিত ভূমিতে এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

পাবদা মাছ জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকে। যেমন-

- **রেণু পর্যায়ঃ** জু-প্ল্যাঙ্কটন ও প্রোটোজোয়া খেয়ে থাকে;
- **জুভেনাইল পর্যায়ঃ** জুপ্ল্যাঙ্কটন ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা;
- **বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায়ঃ** ক্ষুদ্র চিংড়ি, কেচোঁ, বড় জলজ উদ্ভিদের অংশ বিশেষ, ডেট্রিটাস, ইত্যাদি;
- চাষ পুকুরে সম্পুরক খাদ্য হিসাবে সরিষার খৈল ও ফিশ মিল দেয়া যায়।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

পাবদা মাছ প্রথম বছরেই পরিপক্কতা লাভ করে এবং বছরে একবার প্রজনন করে থাকে।এ মাছের প্রজনন মৌসুম হলো মে থেকে আগষ্ট। তবে জুন এবং জুলাই মাসে সর্বোচচ প্রজনন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ভাবে পাবদা মাছ সাধারণত হাওর, বিল ও বন্যা প্লাবিত জলাশয়ে প্রজনন করে থাকে। বর্তমানে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমেও পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। পরিপক্ক ডিমগুলো সবুজ থেকে তামাটে বর্ণের হয়ে থাকে, একটি ৪০-১০০ গ্রাম ওজনের পাবদা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৩২৬০ থেকে ৩১২৮০টি।

গুলশা মাছের জীববিদ্যা (Biology of Golsha fish)

গুলশা মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
Class- Osteichthyes
Order- Cypriniformes
Family- Bagridae
Genus- ***Mystus***
Species- ***M. cavasius***

স্থানীয় নাম : গুলশা
ইংরেজী নাম : Catfish

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

গুলশা মাছের দেহ চাপানো এবং পিঠের অংশ বাঁকা। এ মাছের মুখ বেশ ছোট ও উপরের চোয়াল সামান্য বড়। পৃষ্ঠ ও কানকো পাখনা লম্বা কাঁটাযুক্ত। কানকো পাখনার ডানা করাতের ন্যায় খাঁজকাটা। লেজের ডানা কাঁটাযুক্ত, শরীরের রং জলপাই ধূসর, নিচের দিকে কিছুটা হালকা। শিরদাঁড়া রেখা বরাবর নীলাভ ডোরা দেখা যায়। এ মাছের দৈর্ঘ্য ১৫-২৩ সেমি. হয়ে থাকে। স্ত্রী মাছ পুরুষ মাছের তুলনায় বড় হয়ে থাকে। একক ও মিশ্র পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা যায়।

ছবিঃ গুলশা মাছ

আবাসস্থল

গুলশা বাংলাদেশের সর্বত্র নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, হাওর, ধানক্ষেত, বর্ষায় প্লাবিত ভূমিতে পাওয়া যায়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

গুলশা মাছ জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য খেয়ে থাকে। যেমন-

- **পোনা পর্যায়ঃ** জু-প্ল্যাঙ্কটন ও প্রোটোজোয়া;
- **জুভেনাইল পর্যায়ঃ** জুপ্ল্যাঙ্কটন ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা, মশার লার্ভি এবং পঁচা জৈব পদার্থ;
- **বয়োপ্রাপ্ত অবস্থায়ঃ** প্লাঙ্কটন, ছোট জলজ পোকা, কেঁচো,এবং পঁচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি;
- চাষ পুকুরে সম্পুরক খাদ্য হিসাবে সরিষার খৈল ও ফিশ মিল দেয়া যায়।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

গুলশা মাছ প্রথম বছরেই পরিপক্কতা লাভ করে এবং বছরে একবার প্রজনন করে থাকে। এ মাছের প্রজনন মৌসুম হলো জুন থেকে সেপ্টেম্বর। তবে জুলাই এবং আগষ্ট মাসে সর্বোচ্চ প্রজনন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ভাবে গুলশা মাছ সাধারণত হাওর, বিল, ধানক্ষেত ও বন্যা প্লাবিত জলাশয়ে প্রজনন করে থাকে। বর্তমানে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমেও পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। নিষিক্ত ডিমগুলো সাগু দানার মত আঠালো এবং ক্রীম বর্ণের হয়ে থাকে। একটি ২৮-৫২ গ্রাম ওজনের গুলশা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৬,০০০ থেকে ২২,০০০টি।

বাটা মাছের জীববিদ্যা (Biology of Bata fish)

বাটা মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
Class- Osteichthyes
Order- Cypriniformes
Family- Cyprinidae
Genus- ***Labeo***
Species- ***L. bata***

স্থানীয় নাম : বাটা
ইংরেজী নাম : carp

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

বাটা রুই জাতীয় মাছের শ্রেণী ভুক্ত মাঝারি আকারের ছোট মাছ। দেহের উপরিভাগ কিছুটা ধূসর এবং নিচের অংশ রূপালি। মাথা ছোট তবে মুখ বেশ বড়। মুখে এক জোড়া গোঁফ আছে। দেহের আঁইশগুলো খুব সুস্পষ্ট ভাবে সাজানো। লেজ সমান দু'ভাগে বিভক্ত। এ মাছ বেশ সুস্বাদু ও বাজার মূল্যও বেশি। পুকুরে এবং ধান ক্ষেতে একক ও মিশ্র পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা যায়।

ছবিঃ বাটা মাছ

আবাসস্থল

বাটা বাংলাদেশের সর্বত্র নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, হাওর, ধানক্ষেত, বর্ষায় প্লাবিত ভূমিতে পাওয়া যায়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

বাটা মাছ পেরিফাইটন, ডেট্রিটাস, পোকা-মাকড়ের লার্ভি, প্রোটোজোয়া, শেওলা ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

বর্ষাকালে বাটা মাছ প্রজনন করে। বদ্ধ পানিতে এ মাছ ডিম দেয় না। এক বছরের মধ্যেই প্রজননক্ষম হয় এবং প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে এ মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

চাপিলা মাছের জীববিদ্যা (Biology of Chapila fish)

চাপিলা মাছের শ্রেণীবিন্যাস (Classification)

Phylum - Chordata
Class- Osteichthyes
Order- Clupeiformes
Family- Clupeidae
Genus- ***Gudusia***
Species- ***G. chapra***

স্থানীয় নাম : চাপিলা
ইংরেজী নাম : Herring

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

চাপিলা উজ্জ্বল রূপালি বর্ণের মাছ। শরীর চেপ্টা, উপরের অংশের তুলনায় নীচের অংশ বেশি বাঁকানো। ঘাড়ের কাছে একটি কালো দাগ আছে। এ মাছ ২০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। একক ও মিশ্র পদ্ধতিতে এ মাছ চাষ করা যেতে পারে।

ছবিঃ চাপিলা মাছ

আবাসস্থল

এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল বর্ষায় প্লাবিত ভূমিতে এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

ছোট অবস্থায় পোকা-মাকড়, ও শেওলা খেতে ভালবাসে। প্রাপ্ত বয়সে ফাইটোপ্লাংকটন ও প্রোটোজোয়া খেয়ে থাকে। চাষের পুকুরে সম্পুরক খাদ্য হিসাবে সরিষার খৈল, চাউলের কুঁড়া, গমের ভূঁষি, ফিশ মিল ইত্যাদি খায়।

পরিপক্কতা ও প্রজনন

প্রজনন কাল এপ্রিল-আগষ্ট মাস পর্যন্ত এবং বছরে দু’বার প্রজনন করে। ডিম ধারণ ক্ষমতা ২৫,২০০ থেকে ১৫,৪৫০০

দেশীয় জাতের ছোট মাছের জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়

জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র্য হলো প্রকৃতিতে জীবের ভিন্নতা (Variation) এবং বৈসাদৃশ্যতা (Variability)। অথবা জীববৈচিত্র্য বলতে বুঝায় প্রকৃতির বিচিত্র ধরণের জীব, যা জিন থেকে প্রজাতি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন ধাপে অবস্থিত। অপরদিকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ হলো কতিপয় কার্যক্রমের সমন্বয়, যেমন- কোন কাঙ্খিত জীব বা জীবদের এবং এদের আবাসন ও বংশগতিকে রক্ষা করা; রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; সম্পদের সহনশীল ব্যবহার; জলজ জীবের আবাসস্থল উন্নয়ন বা উপযোগিকরণ; জীববৈচিত্র্যকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের স্বাভাবিক পন্থাকে অক্ষত রেখে তা থেকে বর্তমান প্রজন্ম সর্বোচ্চ তথা টেকসই সুবিধা পেতে পারে।

দেশীয় জাতের ছোট মাছের জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা

জলজ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম। যেখানে পানি সেখানেই মাছ, এ ছিল বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য। একদা এ দেশের নদী-নালা, পুকুর-দীঘি, খাল-বিল, ধানক্ষেত, রাস্তার পাশের ডোবাতে ছিল ছোট মাছের প্রাচুর্য্যতা। এসব মাছের মধ্যে ছিল পুঁটি, টেংরা, মলা, ঢেলা, পাবদা, চান্দা, খলিশা, কাচকি, কৈ, টাকি, বেলে, বাইম, গুলশা, শিং, মাগুরসহ আরও অনেক জাতের মূল্যবান ছোট মাছ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মানুষের বাসস্থান ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য অনেক ছোট বড় জলাশয় ভরাট করে ফেলা হয়েছে। পদ্মা নদীর উজানে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ, মৎস্য সম্পদের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় না এনে বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ কাঠামো নির্মাণ, বর্ষাকালে অত্যধিক পলি জমার কারণে অনেক নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নদীর বুকে জেগে উঠা বিশাল চর সৃষ্টির ফলে সংকুচিত হচ্ছে মাছের আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র। তাছাড়া বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে সেচের জন্য জলাশয় থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনে শীত ও খরা মৌসুমে এসব জলাশয় পুরোপুরি শুকিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ছোট মাছের আবাসস্থল। তাছাড়া বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাপে মাছের অতি আহরণ, মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকর অবৈধ সরঞ্জামাদির ব্যবহার, নদীর নাব্যতা হ্রাস ইত্যাদি কারণে নদীতে মাছের উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং অনেক দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায়। বাংলাদেশে স্বাদুপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ১২টি চরম বিপন্ন, ২৮টি বিপন্ন এবং ১৪টি সংকটাপন্ন প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। স্বাদুপানির বিপন্ন ৫৪ প্রজাতি মাছের মধ্যে ৩২ প্রজাতিই ছোট মাছ যার ৫টি চরম বিপন্ন, ১৮টি বিপন্ন ও ৯টি সঙ্কটাপন্ন বলে সনাক্ত করা হয়েছে। প্লাবনভূমিতে সাধারণত ৫০-৬০ প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে যার অধিকাংশই ছোট মাছের অন্তর্ভূক্ত। যেসব নদীতে কাঠা বা জাগের ব্যবহার বেশি সেসব নদীতে মাছের জীববৈচিত্র্যও বেশি। পক্ষান্তরে শুষ্ক মৌসুমে যে নদীর পানি কমে যায় এবং যেখানে কাঠার পরিমাণ কম সেসব নদীতে মাছের জীববৈচিত্র্যও কম পরিলক্ষিত হয়।

জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ

মানবসৃষ্ট ও পরিবেশগত নানাবিধ কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছের প্রাচুর্য্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে তথা জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। ছোট মাছের জীববৈচিত্র্য হ্রাসে নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য।

১। মাছের অধিক আহরণ

মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবে মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছ আহরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে একদিকে জলাশয়ে মাছের মজুদ হ্রাস পাওয়ায় জলাশয়গুলোতে মাছের আশানুরূপ উৎপাদন হচ্ছে না।

২। অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্লুইচ গেট, রাস্তা, সেচ অবকাঠামো ও কালভার্ট নির্মাণ

মৎস্যসম্পদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় না এনে অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্লুইচ গেইট, সেচ নালা, রাস্তা ও কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের ফলে প্লাবনভূমির আয়তন এবং পানি অবস্থানের সময় কমে যাচ্ছে এবং মাছের প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া যে সকল বিলে সারা বছর পানি থাকত সেগুলো এখন মৌসুমী জলাতে পরিণত হওয়ায় তাতে ডিমওয়ালা মাছ নিয়মিত প্রজনন করতে পারছে না। উপরন্তু অপরিকল্পিত এসব অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নদীর সঙ্গে বিলের বা বিলের সঙ্গে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মাছের প্রজনন অভিপ্রায়ন (Breeding migration) সীমিত হয়ে মাছের প্রজনন বাধাগ্রস্থ হওয়ায় সার্বিক উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

৩। কৃষি ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত ও নিষিদ্ধ কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার

বর্তমানে কৃষিকাজে বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ছোট মাছ তথা মাছ চাষের উপর কীটনাশকের বহুমাত্রিক ক্ষতিকর প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। কীটনাশকের প্রভাবে পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে জলজ পরিবেশের ভারসাম্য ও গুণাবলী নষ্ট হয়। কীটনাশক দ্বারা জলজ পরিবেশ দূষিত হলে যে সকল প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপঃ

- জলজ পরিবেশে বসবাসরত জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাসের আদান-প্রদান ব্যাহত হয়;
- দূষিত পরিবেশে মাছসহ অন্যান্য জলজ জীবের অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা ২-৩ গুণ বৃদ্ধি পায়;
- পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ বৃদ্ধি পেলে পানিতে অর্গানোফসফরাস জাতীয় কীটনাশকের কার্যকারিতা ৩-৪ গুন বৃদ্ধি পায়;
- প্রতিটি ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তনই মাছের বাঁচার হার, বৃদ্ধি ও প্রজনন ক্ষমতা সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। এ ধরণের পরিবর্তন পানির উৎপাদনশীলতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে;
- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ধ্বংস এবং খাদ্য শিকল বিনষ্ট করে;
- মাছের সরাসরি মৃত্যু ঘটায়;
- মাছের ও অন্যান্য জলজ জীবের শারীরবৃত্ত্বীয় পরিবর্তন ঘটে;
- প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয়;
- মাছের রোগ-বালাই বৃদ্ধি পায়।

৪। মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র এবং মাছের আবাসস্থল ধ্বংস/হ্রাস

বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, অপরিকল্পিত রাস্তা ও সেচ খাল নির্মাণ, যত্রতত্র নদ-নদী ভরাট করে অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মাছের আবাসস্থলের সংকোচনের ফলে মাছ তথা ছোট মাছের প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে এবং উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু এসব মাছের প্রকৃত আবাসস্থল তথা প্রাকৃতিক জলাশয়ের Ecosystem-এ মারাত্মক পরিবর্তন সাধন যেমন- জলজ উদ্ভিদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, জলাশয় সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে ফেলার ফলে Benthos ও অন্যান্য জীবের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ছোট মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

৫। প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ নিধন

প্রজনন মৌসুমে কারেন্ট জালসহ অন্যান্য অননুমোদিত ক্ষতিকর জাল ও ফাঁদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন মুক্ত জলাশয় থেকে ডিমওয়ালা ছোট মাছ প্রতিনিয়ত নিধনের ফলে মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছের প্রজনন মারাত্নকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৬। কল-কারখানার বর্জ্যের মাধ্যমে পানি দূষণ

ক্রমাগত শিল্পায়নের ফলে কল-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য প্রতিনিয়ত নির্গত হওয়ায় এর বিষক্রিয়ায় মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ফলে ব্যাপকভাবে মাছ রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে।

৭। নদী ও অন্যান্য মুক্ত জলাশয়ে পলি জমা

খাল-বিল ও নদ-নদীতে ব্যাপকহারে পলি জমার ফলে একদিকে যেমন তাদের উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে হাওর-বাঁওড় ও বিলের গভীরতা হ্রাস পেয়ে পর্যায়ক্রমে সেগুলো ধানক্ষেতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন নদ-নদী ড্রেজিং না করায় এবং বিভিন্ন বাঁধের কারণে শুকনো মৌসুমে প্রায় সব নদী শুকিয়ে নদ-নদীতে পানির প্রবাহ কমে যায়। তাছাড়া ক্রমাগত নদী ভাঙ্গন এবং বন উজারের ফলে পলি জমার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় ছোট মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র কমে যাচ্ছে।

৮। খাল-বিল ভরাট করে জনপদ গড়ে উঠা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাল-বিল ভরাট করে নতুন করে বসতবাড়ী ও শিল্প কারখানা নির্মিত হচ্ছে। এতে জলাশয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

৯। জলাভূমিকে কৃষি ভূমিতে রূপান্তর

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত জনগোষ্ঠির খাদ্য চাহিদা মেটাতে জলাভূমিগুলোকে ক্রমাগত কৃষি জমিতে রূপান্তর করা হচ্ছে।

১০। প্লাবন ভূমির Ecosystem পরিবর্তন

জলাভূমির অবক্ষয় যেমন- সেচ কার্যক্রম, পলি জমাট, কল-কারখানা হতে নির্গত বর্জ্য, অতি আহরণ, ডিমওয়ালা মাছ নিধণ, প্রজনন ক্ষেত্রের পরিবর্তন ও হ্রাস, পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্লাবনভূমির Ecosystem ধ্বংস হচ্ছে।

১১। পানি শুকিয়ে বা সেচে মাছ আহরণ

সাধারণত শুকনো মৌসুমে ডিমওয়ালা ছোট মাছগুলো পরবর্তী প্রজনন মৌসুমে ডিম ছাড়ার অপেক্ষায় ছোট ছোট জলাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেচ কাজে অথবা মাছ ধরার জন্য এসব জলাশয়গুলো সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে ফেলায় ডিমওয়ালা ছোট মাছ ও তাদের আবাসস্থল ধ্বংস হওয়ায় বংশ বৃদ্ধিতে বাধাগ্রস্থ হয়।

১২। কৃষি জমিতে অতিমাত্রায় সেচ

উচ্চ ফলনশীল ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে যেমন ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাশয়সমূহের পানি হ্রাস পাচ্ছে তেমন ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে জলাশয়সমূহে কাংখিত মাত্রায় পানি না থাকায় ছোট মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ও আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে।

১৩। বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত চাষ ব্যবস্থাপনায় রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ

কার্প ও অন্যান্য মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্ত্ততির অংশ হিসাবে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণের নিমিত্তে বিষ প্রয়োগ করা হয়। ফলে ঐ জলাশয়ের ছোট মাছ সমূহ সম্পূর্ণভাবে নিধন হয়ে যায় এবং Ecosystem সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

১৪। কারেন্ট জালসহ অন্যান্য অননুমোদিত ক্ষতিকর জাল ও ফাঁদের ব্যাপক ব্যবহার

অবৈধ কারেন্ট জালসহ অন্যান্য অননুমোদিত জাল (যেমন- বেহুন্দি জাল, মশারী জাল, ভেসাল জাল ইত্যাদি) ও ফাঁদ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন জলাশয় থেকে নির্বিচারে ডিমওয়ালা ছোট মাছ ও পোনা নিধন করা হচ্ছে।

১৫। মাছের রোগ

১৯৮৮ সাল থেকে ছোট মাছ বিশেষ করে দেশীয় পুঁটি ও টাকি মাছ ব্যাপকভাবে ক্ষতরোগে আক্রান্ত হয়। ফলে এ দু'টি প্রজাতিসহ অন্যান্য কিছু ছোট মাছের প্রাচুর্যতা কমে যায়।

১৬। বিদেশী প্রজাতির মাছের প্রভাব

অতিমাত্রায় বিদেশী মাছের চাষ সম্প্রসারণের ফলে দেশীয় ছোট মাছের জীববৈচিত্র ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় ছোট মাছের বিস্তার হুমকীর সম্মুখীন।

১৭। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাংশে পানির অভাব

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব বিশেষ করে উত্তর পশ্চিমাংশে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করায় প্রতিনিয়ত জলাভূমির পরিবর্তন হচ্ছে। উত্তর পশ্চিমাংশে ক্রমাগত মরুকরণ প্রক্রিয়ার ফলে নদ-নদীসহ অন্যান্য জলাশয় শুকিয়ে যাওয়ায় মৎস্যকুল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ছোট মাছ সংরক্ষণ কৌশল

বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ছোট মাছের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। ছোট মাছকে এ দেশে প্রকৃতির আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে ছোট মাছের অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হচ্ছে আবাসস্থলের ব্যাপক সংকোচন এবং নদী-নালা খাল-বিলের জলজ পরিবেশের বিবর্তন। অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীন উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে সামগ্রিকভাবে অন্যান্য মাছের মতো ছোট মাছের উৎপাদনও ক্রমশঃ কমে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে এসব মাছ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ছোট মাছকে অবাঞ্ছিত মাছ হিসাবে গণ্য না করে এদেরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের আওতায় আনতে হবে। জলজ পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছোট মাছের বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে এদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ে পরিকল্পিত অভয়াশ্রম স্থাপন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ছাড়াও রাজস্বভিত্তিক ইজারা প্রথার পরিবর্তে জলমহালের জৈবিক উৎপাদনমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে জলজ সম্পদের সহনশীল ব্যবহার, আবাসস্থল উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্যকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বিপন্নতার হাত থেকে মূল্যবান মৎস্য প্রজাতিসমূহ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পুকুরে রুইজাতীয় মাছের সাথে ব্যাপকভাবে ছোট মাছের মিশ্রচাষ ও এদের সংরক্ষণে গণসচেতনতা বৃদ্ধিসহ সম্প্রসারণে আরও সচেষ্ট হতে হবে। ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে চাষিদের পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ সম্প্রসারণে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

ছোট মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি তথা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিম্নোক্ত কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

১। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা

মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে দেশের নদ-নদী বা অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছের অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত আহরণ বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে সারাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও বিলের নির্বাচিত অংশে নিয়ন্ত্রিতভাবে ছোট মাছের আহরণ বন্ধ ও তাদের বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ধরণের ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক প্রজননের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ছোট মাছের বংশ বিস্তার ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। প্রাকৃতিক জলাশয়ে বিশেষ কিছু স্থান রয়েছে যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বসবাস করে ও প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে, এসব স্থানে মাছের সযত্ন সংরক্ষণ ও পরিচর্যা মাছের বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি করবে।

সবসময়ই পানি থাকে এমন কয়েকটি সুবিধাজনক স্থান ঘেরাও করে ডালপালা ফেলে মাছের জন্য সুরক্ষিত আশ্রয় সৃষ্টি করতে হবে। এখানে কোন সময়ে মাছ ধরা যাবে না বা এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে না, যা ঐ স্থানের পরিবেশকে নষ্ট করে। অভয়াশ্রমে মাছ নিরাপদে থাকবে, বড় হবে ও বর্ষা আগমনের সাথে সাথে প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করবে। পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন জন্ম নেয়া পোনা মাছ প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে। আবার প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়স্থল ছেড়ে বড় মাছও খাদ্যের অন্বেষণে অভয়াশ্রমের বাইরে বেরিয়ে আসবে। এদের মধ্যে অনেক মাছই জেলেদের জালে ধরা পড়বে ও কিছু অভয়াশ্রমে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান নেবে। পরের বৎসর এরা আবার ব্রুডস্টক হিসেবে বংশ বিস্তারে সহায়তা করবে। এভাবে মৎস্য প্রজাতির জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ আরও বেশি পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত হবে।

২. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন

সারাদেশে ছোট ছোট অনেক নদী ও খাল-বিল এবং তদ্সংলগ্ন জলাশয়সমূহ বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে ছোট মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজননের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সকল জলাশয় সামান্য সংস্কার করে পূনরায় ছোট মাছের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করা যেতে পারে। তাছাড়া সংস্কার করে প্লাবনভূমির সাথে খালের মাধ্যমে নদ-নদীর সংযোগ পুনঃস্থাপন করতে হবে। মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম ছোট মাছের বংশ বিস্তার এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. চাষের মাধ্যমে ছোট মাছ সংরক্ষণ

রুইজাতীয় মাছ ও অন্যান্য মাছ চাষে পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে ছোট মাছকে অবাঞ্ছিত হিসাবে গণ্য করে পুকুর সেচে বা বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে এদের নিধন করা হতো। ফলশ্রুতিতে এসকল মাছের প্রাচুর্য্যতা হ্রাস পেতে থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- ছোট মাছ চাষের গুরুত্ব অনুধাবন, উপযোগি পুকুরের ধরণ, প্রাকৃতিক প্রজনন, খাদ্য ও খাদ্য গ্রহণের স্বভাব সম্পর্কে ধারণা থাকা;
- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ পুকুরে মুজদ করা;
- ছোট প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধি ও খাদ্যের যোগানের সুবিধার্থে পুকুরের কিনারে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জলজ উদ্ভিদ যেমন- কলমি, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা করা;
- ধানক্ষেতে ছোট প্রজাতির মাছ চাষের ব্যবস্থা করা এবং এ ধরনের ছোট মাছ সারা বছর প্রাপ্তির সুবিধার্থে ধানক্ষেতে ছোট আকারের মিনি পুকুর তৈরী করা;
- ছোট মাছের প্রজনন মৌসুম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনগণকে সচেতন করা এবং সে সময় পুকুরে জাল টানা থেকে বিরত থাকা অথবা প্রয়োজনে বড় ফাঁস বিশিষ্ট জাল ব্যবহার করা;
- পুকুর প্রস্তুত করার সময় রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণে বিষ প্রয়োগকে নিরুৎসাহিত করা এবং বার বার জাল টানা পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
- জলাশয় ও রাস্তার পাশের খাদে অথবা বরোপিটে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছোট মাছ চাষ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য পোনার ওপর ভিত্তি করে রুইজাতীয় মাছের সাথে ছোট মাছের মিশ্রচাষ করা;
- পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় সম্পূর্ণরূপে সেচে মাছ আহরণ করা থেকে বিরত থাকা, তবে পুকুর শুকানো আবশ্যক হলে এক কোনায় কুয়া বা গর্ত তৈরী করে ছোট প্রজাতির মাছ রাখার ব্যবস্থা করা।

এসব ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পুকুরে অন্যান্য মাছের সাথে ব্যাপকভাবে ছোট মাছের মিশ্র চাষ ও ছোট মাছ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ এদের চাষ সম্প্রসারণে আরও সচেষ্ট হতে হবে। ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে চাষীদের পুকুরে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ ও সম্প্রসারণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

৪. ফিশ পাস ও ফিশ ফ্রেন্ডলি কাঠামো নির্মাণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বা পোল্ডার এবং গ্রামাঞ্চলে অপরিকল্পিত কাঁচা-পাকা রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণের ফলে প্লাবনভূমিতে ছোট মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ হুমকির সম্মুখীন। এসব অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নদী থেকে বিলে বা বিল থেকে নদীতে মাছের প্রজনন তথা সার্বিক অভিপ্রায়ণ বাধাগ্রস্থ হওয়ায় দেশে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ফিশ পাস বা ফিশ ফ্রেন্ডলি অবকাঠামো নির্মাণ করে মাছের অবাধ যাতায়াত ও প্রজনন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে এ সমস্যা অনেকাংশে দূর করা এবং প্লাবন ভূমিতে দেশীয় ছোট মাছের ব্যাপক বংশ বিস্তার ঘটানো সম্ভব হবে। মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর

উপজেলাধীন পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসংলগ্ন মনু নদীতে CIDA[1] এর আর্থিক সহায়তায় একটি ফিশ পাস নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ফিশ পাসটির কার্যক্রম ইতোমধ্যে অত্যন্ত ফলপ্রসু বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিকল্পিত উপায়ে আরও এ ধরণের কাঠামো পর্যায়ক্রমে গড়ে তুলতে হবে।

৫. দেশীয় জাতের ছোট মাছের পোনা উৎপাদন ও প্লাবনভূমিতে মজুদকরণ

দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছসমূহের ক্রমহ্রাসমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্লাবনভূমিতে পর্যায়ক্রমে ছোট মাছের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অতি বিপন্ন ও সংকটাপন্ন ছোট মাছগুলোর প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা জলাশয়ে ছাড়া উচিত। অনেক ছোট মাছ যেমন কৈ, গুলশা, পাবদা, মাগুর, শিং, মেনি, বাটা, তারা বাইমসহ বেশ কিছু মাছের প্রণোদিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। আরও যে সমস্ত ছোট মাছের জন্য এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে তার মধ্যে রয়েছে খরল্লা, তাপসি, বাইম, গুঁচি, ফলি, ভাগনা, বেলে, টেংরা, কাজলী, বাতাসী ইত্যাদি।

৬. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন

নির্বিচারে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির পথে বড় অন্তরায়। এ কারণে আমাদের দেশে মৎস্য সম্পদ বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। মাছের বিলুপ্তি রোধকরণ, নিয়ম মাফিক মৎস্য আহরণ, প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষা করার জন্য মৎস্য আইন অতীব জরুরী। এ আইনে

ক) নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না, এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা সীজ ও বাজেয়াপ্ত করা যাবে;
খ) সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতীত নদী-নালা, খাল-বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ ইত্যাদি বা কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
গ) জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্যবিধ উপায়ে মাছ ধ্বংস বা ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না;
ঘ) মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেমি বা তদাপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট কারেন্ট জাল বা ফাঁস জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

এ আইন অমান্যকারীকে প্রথমবার অপরাধের জন্য কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা জরিমানা। পরবর্তী প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা জরিমানা। তাছাড়া মৎস্য সংরক্ষণ আইন আরও যুগপোযোগীকরণ ও প্রচলিত মৎস্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং জনগণকে আইন মানতে সচেতন করতে পারলে মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় ছোট মাছের প্রাপ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

৭. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

ছোট মাছের বর্তমান আশংকাজনক অবস্থার উত্তরণ ও তাদের আবাসস্থল পূণরুদ্ধারের ব্যাপারে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে হবে। শুকনো মৌসুমে সেচের মাধ্যমে জলাশয়সমূহকে পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলা, শস্যক্ষেতে নিষিদ্ধ কীটনাশক অতিমাত্রায় ব্যবহার এবং ব্যাপকহারে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধনের কুফল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে হবে। পুকুর প্রস্ত্ততির সময় ছোট মাছ নিধনের জন্য বিষ, রোটেননসহ অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহারে সর্তকর্তা অবলম্বন করা উচিত। বিভিন্ন সময়ে পুকুরে চাষের জন্য নিয়ে আসা বিদেশী প্রজাতির মাছ বন্যার পানিতে ভেসে যাতে উন্মুক্ত জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ সর্তকর্তা অবলম্বন করতে হবে।

৮. বাংলাদেশে ছোট মাছ বিষয়ক গবেষণা

মূলত ১৯৮৮ সাল থেকে ছোট মাছ সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। মৎস্য অধিদপ্তর ৭০-৮০'র দশকে জিওল মাছ বিশেষত মাগুর মাছের প্রজনন ও চাষের ওপর প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯৫ সনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় IFADEP SP-2 প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ছোট মাছ যেমন- মলা, ঢেলা, ভাঙ্গান বাটা, ভাংনা, চাপিলা, বাইম ও খলিশা মাছের মিশ্রচাষের ওপর নিরীক্ষামূলক কাজ হয়।----সনে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ছোট মাছ যেমন- মলা, ঢেলা, ভাঙ্গান বাটা, ভাংনা, চাপিলা, বাইম ও খলিশা মাছের মিশ্রচাষের ওপর নিরীক্ষামূলক কাজ হয়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট পাবদা, গুলশা, মাগুর, শিং, কৈ ও বাটা মাছের প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনার ওপর সফল প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে একাডেমিক গবেষণা কাজের অংশ হিসাবে সত্তর দশক থেকে বিভিন্ন ছোট মাছের বিশেষ করে মাগুর, শিং, পুঁটি,

---

[1] Canadian International Development Agency.

মলা প্রভৃতি মাছের জীবতাত্বিক, প্রজনন, চাষ, সম্পূরক খাদ্য উদ্ভাবন ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে।

দেশীয় জাতের ছোট মাছ সংরক্ষণে অভয়াশ্রমের ভূমিকা

মৎস্য অভয়াশ্রম হলো মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। দেশীয় জাতের ছোট মাছ সংরক্ষণ ও জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় মৎস্য অভয়াশ্রমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১২ প্রজাতির বিদেশি মাছসহ মোট ২৯৬ প্রজাতি মাছই হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীন মৎস্য সম্পদ। এদের মধ্যে প্রায় ১৫০ প্রজাতিই হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ। এ দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণে এসব ছোট মাছের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া হতদরিদ্র মৎস্যজীবী ও ক্ষুদ্র আয়ের মানুষ এক সময় খাল, বিল, নদী-নালা হতে এসব মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। ছোট মাছকে প্রকৃতির আর্শিবাদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এক সমীক্ষায় দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছকে গ্রামীণ জনপদে গরীব মানুষের প্রিয় খাবার এবং পুষ্টির প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে (ফ্যাপ-১৬, ১৯৯৫)। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মাছের অতি আহরণ, আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস, জলাশয় সেচে মাছ আহরণ, মৎস্য সম্পদ বিনাশী সরঞ্জামাদির ব্যাপক ব্যবহার, মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ, কলকারখানার বর্জ্য, ইঞ্জিন চালিত নৌযান থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য, অপরিকল্পিত ভাবে জলাশয় ভরাট করে কলকারখানা নির্মাণ, মৎস্য সম্পদের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় না এনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ স্থাপনা নির্মাণ, মাছের রোগ, বন উজাড় ইত্যাদি কারণে ছোট মাছের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে অনেক প্রজাতি অস্তিত্ব বর্তমানে হুমকির মুখে । পূর্বে ধারণা করা হতো মাছ চাষে ছোট মাছ বড় মাছের মত বাড়ন্ত ও লাভজনক নয় এবং ছোট মাছ বড় মাছের প্রতিযোগী ও ক্ষতিকর। তখন ছোট মাছের বাজার দরও ছিল কম। এসব কারণে পুকুরে রুই জাতীয় মাছের সাথে দেশীয় ছোট মাছ চাষ করার প্রয়োজনীয়তা মনে করা হতো না বরং অবাঞ্চিত মাছ মনে করে পুকুরে বিষ প্রয়োগে এদের সমূলে বিনাশ করা হতো। কিন্তু দেশীয় ছোট মাছ বিষয়ে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেশীয় জাতের ছোট মাছ একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং দিন দিন এদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাষের মাধ্যমে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণে ছোট মাছের উৎপাদনও বাড়ানো প্রয়োজন। এ জন্য দেশীয় জাতের ছোট মাছ চাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জলাশয়ে তাদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অভয়াশ্রম স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লাগসই কৌশল।

মৎস্য অভয়াশ্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন বা ঘোষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা;
- মাছের অবাধ প্রজনন নিশ্চিত করা ও বিচরণ ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা;
- নিরাপদ আশ্রয় সৃষ্টির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা;
- মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা;
- প্রাকৃতিক মৎস্য মজুদ ও সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো;
- মাছের প্রজাতিগত ও বংশগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা;
- মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা।

মৎস্য অভয়াশ্রমের প্রকারভেদ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং জলাশয় ভেদে অভয়াশ্রম বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

মৌসুমী অভয়াশ্রম

নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রজনন ক্ষেত্রে প্রজনন ঘটায় এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিচরণ করে থাকে। তাই অবাধে প্রজনন ও বিচরণের লক্ষ্যে সে নির্দিষ্ট এলাকা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছের অভয়াশ্রম হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যেমন- হালদা নদীর মদুনা ঘাট এলাকা, কাপ্তাই লেকের লংগদু ও বিলাই ছড়ি এলাকা।

সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম

জলাশয়ের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট বছরের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হলে তাকে সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম বলা হয়। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অনেক হাওরের কোন কোন বিলে পাইল ফিশারী করে ২-৩ বছর অন্তর অন্তর মাছ ধরা হয়। এ পাইল ফিশারীকে প্রকারান্তরে সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম বলা যেতে পারে।

দীর্ঘ মেয়াদী বা স্থায়ী অভয়াশ্রম

কোন কোন অঞ্চলে কোন নদী বা বিলের সম্পূর্ণ অংশে বা এর একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা দীর্ঘ মেয়াদে বা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। এরূপ এলাকাকে দীর্ঘ মেয়াদী বা স্থায়ী অভয়াশ্রম বলা হয়ে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তরের ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকগুলো অভয়াশ্রম তৈরী করা হয়েছে, তার মধ্যে মেঘনা ব্লক-২ অভয়াশ্রম, পুরাতন ব্রম্মপুত্র নদ অভয়াশ্রম, আড়িয়াল খাঁ নদী অভয়াশ্রম উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের ভাল আবাসস্থল তথা স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশ;
- সারা বছর পানি থাকে এমন জলাশয় বা জলাশয়ের অংশ বিশেষ;
- জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উপস্থিতি;
- জলাশয়ে লক্ষ্য বা মূখ্য প্রজাতির প্রাচুর্যতা;
- জলাশয়ে বিলপ্তপ্রায় প্রজাতির পুনঃআবির্ভাবের সম্ভাবনা;
- জলাশয়টি কম জনবসতি ও কম কর্মতৎপর স্থানে হওয়া উচিত;
- জলাশয়টি দূষণমুক্ত এলাকায় হতে হবে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হলে সরেজমিনে স্থান পরিদর্শন পূর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। নদী নিবাসী মাছের জন্য নদীতে এবং বিল নিবাসী মাছের জন্য বিলে অভয়াশ্রম স্থাপন করা উচিত। স্থানীয় জনগণ ও মৎস্যজীবীদের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে অভয়াশ্রমের স্থান ও আকার ঠিক করা আবশ্যক। সাধারণত নদী অথবা অন্য কোন জলাশয়ের এমন অংশে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে নির্দিষ্ট মৌসুমে অথবা সারা বছর মাছ ধরা বন্ধ রাখা সম্ভব। নদ-নদী বা বিলের এমন কোন গভীর অংশ বা পকেট নির্বাচন করতে হবে যেখানে মাছের আনাগোনা বেশি, তুলনামূলক ভাবে স্রোত কম, পলি জমার সম্ভাবনা কম, নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে না এবং জনগণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। জলাশয়ের কত ভাগ এলাকায় অভয়াশ্রম হবে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা না গেলেও মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, শুষ্ক মৌসুমে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের আয়তনের শতকরা ৫০ ভাগ এলাকাকে অভয়াশ্রম হিসাবে রাখা যেতে পারে। তবে আয়তন নির্ধারণ কালে জলাশয় সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। প্লাবনভূমি ও বিল এলাকায় ৪০০-৫০০ বর্গমিটারের ডোবায় অভয়াশ্রম তৈরি করেও সুফল পাওয়া গেছে। অভয়াশ্রম স্থাপনের নিমিত্ত নির্বাচিত এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে চারদিকে লাল পতাকা দিয়ে রাখতে হবে এবং এর ভিতরে কাঠা স্থাপন করতে হবে।

মৎস্য অভয়াশ্রমের ফলপ্রসু ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সুফলভোগী জনগোষ্ঠী ও মৎস্যজীবীর মধ্য হতে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যা পরবর্তীতে মৎস্য সমাজভিত্তিক সংগঠন (FCBO[2]) হিসাবে বিবেচিত হবে। অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের স্থায়ীত্বশীলতার লক্ষ্যে এ সংগঠনের একটি অনুমোদিত গঠনতন্ত্র থাকবে এবং সংগঠনটি সরকারের নিবন্ধন সংস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। সংগঠনের ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে অভয়াশ্রম নিকটস্থ স্থানে একটি কমিউনিটি-কাম-ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে। এ জন্য কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করতে হবে। যেমন- লাল পতাকা চিহ্নিত সীমানা হতে ২০০ মিটার দূরে মাছ ধরা, বৈশাখ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত মাছ না ধরা, নির্দিষ্ট ফাঁসের জাল ব্যবহার, অভয়াশ্রমে পাহাড়াদার নিয়োগ, নিয়ম ভঙ্গাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির সংগে যোগসূত্র স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিল বোর্ড স্থাপন। প্রয়োজনে কিছুদিন পর পর অভয়াশ্রম সংস্কার সাধন করতে হবে।

---

[2] Fisheries Community Based Organization.

অভয়াশ্রমে দেশীয় জাতের ছোট মাছের পোনা মজুদকরণ

দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়সমূহে দেশীয় জাতের ছোট মাছের ক্রমহ্রাসমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত অভয়াশ্রমে পর্যায়ক্রমে দেশীয় ছোট মাছের পোনা/মা মাছ মজুদ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অতিবিপন্ন ও সংকটাপন্ন ছোট মাছের প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা বা মা মাছ মৎস্য অভয়াশ্রমে অবমুক্ত কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, অনেক ছোট মাছ যেমন- কৈ, শিং, মাগুর, গুলশা, পাবদা, মেনি, বাটা, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন হচ্ছে।

অভয়াশ্রমের প্রভাব

অভয়াশ্রম সৃষ্টির ফলে অভয়াশ্রম এলাকায় প্রজননের জন্য প্রচুর প্রজননক্ষম মাছ এবং পোনাসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সমাহার ঘটে। এর প্রভাবে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের সংগে যুক্ত অন্যান্য অংশে এবং পার্শ্ববর্তী জলাশয়েও মাছের উৎপাদন এবং প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পায়। মৎস্য অধিদপ্তরের ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অভয়াশ্রমের মধ্য হতে ২৭টি জলাশয়ের সুফলভোগীদের নিকট হতে সংগৃহীত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মাছের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় শতকারা ১৫ থেকে ২০০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রম স্থাপনের ২-৩ বছরের মধ্যে এসব জলাশয়ের মাছের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ১২০ কেজি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৯.৪ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। ২৭টি জলাশয়ের মধ্যে ২৩টি জলাশয়ে মাছের প্রজাতি সংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থানীয় ভাবে বিলুপ্তপ্রায় ২৪টি প্রজাতির মাছের পুনঃআবির্ভাব ঘটেছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট জলাশয়গুলোতে পূর্বে খুবই কম পাওয়া যেত এমন বিপন্ন ২৩টি প্রজাতি মাছের প্রাচুযর্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি মৎস্যজীবীদের আয় বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মাচ্ (MACH[3]) প্রকল্প ও নতুন জলমহাল নীতিমালাভুক্ত উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলমহালে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অনুরূপ ফলাফল পাওয়া গেছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে বিদ্যমান মাছের প্রজাতিসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে জলজ জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিহীনতা চরম আকার ধারণ করবে। তাই এখনই আমাদের সচেতন হওয়া দরকার এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের স্বার্থে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, বিল, প্লাবনভূমি, উপকূলীয় অঞ্চলের উপযুক্ত স্থানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনের মাধ্যমে অভয়াশ্রম স্থাপন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রশাসনসহ জনপ্রতিনিধি, এনজিও, প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীগণ সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসলে সর্বসাধারণের মাঝে এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে।

ছোট মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আধিক্য, মাছের আবাসস্থল ধ্বংস, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে জলাশয়গুলোতে মাছের প্রাপ্যতা হ্রাস পাওয়ার কারণে ছোট বড় অনেক মাছই প্রাকৃতিক পরিবেশে হতে হারিয়ে যাওয়ার পথে। এক সময়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকার মলা, ঢেলা, চাপিলা, মেনি, চান্দা, টেংরা, কৈ, শিং, মাগুর, বাতাসিসহ যে সকল ছোট মাছ ছিল পুষ্টির অন্যতম উৎস্য, সে সকল মাছই আজ দুষ্প্রাপ্য। যুগ-পরিক্রমায় ধনী-গরীব সকল মানুষের খাদ্য তালিকায় বেড়েছে এ সকল ব্যাপক চাহিদা। উচ্চ পুষ্টিমান, স্বাদের ভিন্নতা, ওষধি গুণাগুণ এ সকল মাছকে একদিকে যেমন করেছে জনপ্রিয় অন্যদিকে করেছ দামী এবং বাড়িয়েছে তাদের কদর। এখন ধনী-গরীব সকল মানুষের কাছেই এ সকল ছোট মাছ সমানভাবে সমাদৃত। অন্যদিকে, গ্রামের সাধারণ গরীব মানুষ যাদের পক্ষে বেশি অর্থ খরচ করে বড় মাছ কেনা সম্ভব হয়না, তা অল্প খরচে নিজের পুকুরে সহজেই কার্পজাতীয় মাছের সাথে মলা, পুঁটি ইত্যাদি ছোট মাছ চাষ করে পারিবারিক চাহিদা মেটাতে পারে। এজন্য প্রয়োজন ছোট মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনের ওপর বিভিন্ন কলাকৌশলের উন্নয়ন।

প্রজনন

প্রজনন হল জনতা/জীবের বর্ধনের জন্মগত ক্ষমতা। প্রজনন দ্বারা জীব নতুন জীবের বা সন্তানের জন্ম দেয়। এ সব নতুন জীবের জন্ম প্রসব, ডিম ফুটে বা বিভাজন দ্বারা হতে পারে। এক কথায়, যে কোন পদ্ধতিতে পুরাতন/পরিপক্ক জীব থেকে নতুন জীবের জন্ম হওয়াটাই হল প্রজনন। মৎস্য প্রজননের ক্ষেত্রে সাধারনতঃ ডিমফুটে নতুন জীবের জন্ম হয়। মাছকে প্রাকৃতিক ও প্রণোদিত উপায়ে প্রজনন করা যায়।

প্রাকৃতিক প্রজননে মাছ প্রাকৃতিক পরিবেশে (যেমন নদ-নদীতে) স্বেচ্ছায় প্রনোদিত হয়ে প্রজনন করে থাকে। আর প্রণোদিত প্রজননে কৃত্রিমভাবে হ্যাচারিতে মাছকে হরমোন বা উত্তেজক ব্যবহার করে প্রজনন করানো হয়।

ছোট মাছের প্রজনন

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যেমন নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, প্লাবনভূমি ইত্যাদিই মূলত ছোট মাছের বিচরণ ক্ষেত্র। উক্ত বিচরণক্ষেত্রেই সাধারণত ছোট মাছ প্রাকৃতিক ভাবে প্রজনন করে থাকে। তবে ছোট মাছের প্রজনন সম্পাদন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্লাবনভূমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই প্লাবনভূমি বিদ্যমান। বর্ষা মৌসুমে সব জলাশয় অর্থাৎ নদী-খাল-প্লাবনভূমি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও জীবনচক্র সম্পাদনে এ ধরণের পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রাকৃতিকভাবে ছোট মাছ সাধারণত খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দিঘী, ডোবা-নালা ও নিমজ্জিত ধান ক্ষেত ইত্যাদি স্থানে প্রজনন করে থাকে। যে সমস্ত স্থানে বর্ষার প্রথম বৃষ্টির পানি জমে, কিছু কিছু ছোট মাছ সে সকল স্থানে প্রজনন করে। এদের মধ্যে আবার অনেক ছোট মাছ রয়েছে মাইগ্রেটরী স্বভাবের। তারা প্রজনন করার জন্য মৌসুমে অন্যত্র মাইগ্রেট করে।

নদী ও প্লাবনভূমির ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন ছোট মাছের খাদ্য ও প্রজনন এবং চলাচল বা মাইগ্রেশনে প্রভাব বিস্তার করে। বর্ষার শুরুতে (এপ্রিল-জুন) এবং ভরা বর্ষায় (জুলাই) নদীর সাথে খাল-বিলের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এ সময় অনেক ছোট মাছ মাইগ্রেশন করে প্রজনন করে থাকে। বর্তমানে জলজ আবাসস্থলের অবক্ষয়ের কারণে অধিকাংশ ছোট মাছের চলাচল পথ বিঘ্নিত হচ্ছে ফলে ছোট মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে আসছে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য ও প্রজনন বাধাগ্রস্থ হয়ে মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

ছোট মাছের জীবন চক্রের স্থায়িত্বকাল খুবই কম। এদের অধিকাংশই বর্ষা ঋতুতে একাধিকবার প্রজনন করে থাকে। গ্রীষ্মকালে অধিক বৃষ্টির পর পরই ছোট মাছ স্রোতের বিপরীতে মাইগ্রেশন করে - যা তাদেরকে প্রজননে সহায়তা করে। এরপর মাছগুলি বিভিন্ন জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছোট ছোট পোনা প্রাকৃতিক লালনক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণ করে বড় হতে থাকে।

টেবিলঃ বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন ঋতু এবং ডিম ধারণক্ষমতার তুলনামূলক চিত্র

প্রজাতি	**প্রজননকাল**	**ডিম ধারণ ক্ষমতা**	**গবেষক**
মলা	মে-অক্টোবর (সর্বানুকুল: আগস্ট)	৩,৫৯৬±১৫০ (৭৫-৮০ মিমি মাছ)	Parveen 1984 Afroze & Hossain 1983, 1990
পুঁটি	মে-অক্টোবর (দুইটি প্রজনন ঋতু)	১,৪০০ - ১,৯০০	Mustafa 1991
মলা	মে-অক্টোবর	১,০২০ - ৬,৮০০	Kohinoor 2000
পুঁটি		৩,২৬০ - ৩১,২৮০	
চেলা		৯২০ - ২,৮৩০	
খলিশা	মার্চ-এপ্রিল	১,৫৮০ - ২,৬৮০	Banu *et al.* 1984, Mustafa 1991
দারকিনা	মার্চ-জুলাই (সর্বানুকুল: এপ্রিল-মে)	৩৯০ - ২,৪০০	Dewan 1973, Parveen *et al.* 1993
চাপিলা	এপ্রিল-আগস্ট	২৫,২০০ - ১৫৪,৫০০	Kabir *et al.* 1998
ঢেলা	মে-জুলাই	১,০৫০ - ৯,৩৬০	Islam 2000
শিং	জুন-জুলাই	৮,০০০-১০,০০০ (৪০-৭০ গ্রাম ওজনের মাছ)	Mollah *et al.* 2005
মাগুর	জুন-জুলাই	৭,০০০-৮,০০০ (৮০-১০০ গ্রাম ওজনের মাছ)	Mollah *et al.* 2005
কৈ	জুন-জুলাই	৬,০০০-৮,০০০ (৮০-১০০ গ্রাম ওজনের মাছ)	Mollah *et al.* 2005
পাবদা	মে-আগস্ট (সর্বানুকুল: জুন-জুলাই)	১১,০০০-২০,০০০ (৪০-১০০ গ্রাম ওজনের মাছ)	Hossain & Kohinoor 2005
গুলশা	জুন-সেপ্টেম্বর (সর্বানুকুল: জুলাই-আগস্ট)	৬,০০০-২২,০০০ (২৮-৫২ গ্রাম ওজনের মাছ)	Hossain & Kohinoor 2005

কতিপয় ছোট মাছের প্রজনন কৌশল

অতীতে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন খাল-বিল, প্লাবনভুমি, ধানক্ষেত, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদিতে ছোট মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত এবং এ ধরণের আবাসস্থলেই অধিকাংশ ছোট মাছ ব্যাপক হারে প্রজনন করতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে পরিবেশগত বিপর্যয় ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে এ সকল মাছের প্রজনন ও চারণ ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় এদের প্রাচুর্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাই অর্থনৈতিক ও পুষ্টিগত গুরুত্বসম্পন্ন কতিপয় ছোট মাছের কৃত্রিম প্রজননের উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বেশ কিছু ছোট মাছের প্রণোদিত কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে।

নিম্নে কতিপয় ছোট মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল সংক্ষেপে আলোচিত হল-

১। কৈ মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

কৈ মাছ সাধারণত: খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-দিঘী, ডোবা-নালা এবং নিমজ্জিত ধান ক্ষেতে দেখতে পাওয়া যায়। এ মাছগুলো আড়ালিয়া জাতীয় উদ্ভিদ যেমন কলমি, হেলেঞ্চা এবং জলজ অন্যান্য ঝোঁপ-ঝাড় ও ডাল-পালা অধ্যুষিত জলাশয়ে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পছন্দ করে। কৈ মাছ গর্তে নিমজ্জিত গাছের গুড়ির তলায় বা সুড়ঙ্গে বসবাস করে এবং স্রোতহীন আবদ্ধ পানিতে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক প্রজনন

- কৈ মাছ প্রথম বছরেই প্রজননক্ষম হয়, সর্বোচ্চ ১৭ সেমি. লম্বা হয় এবং বছরে একবার প্রজনন করে;
- কৈ মাছের সর্বানুকুল প্রজননকাল এপ্রিল-জুলাই মাস। তবে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তও প্রজনন করে থাকে;
- প্রজনন শুরুর পূর্বে বর্ষার বৃষ্টি নামলেই এদেরকে প্রজননের জন্য মাইগ্রেট করতে দেখা যায় এবং মাইগ্রেট করে এরা ধানক্ষেত, ডোবা, পকুর-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি স্থানে চলে যায়। কৈ মাছ সাধারণত যে জায়গায় বসবাস করে সে জায়গায় প্রজনন করে না। তাই ব্রিডিং মাইগ্রেশনের মাধ্যমে স্থান বদল করে নেয়। অতঃপর নতুন স্থানে ঝোঁপ-ঝাড় জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ডিম ছাড়ে;
- কৈ মাছের ডিম ভাসমান। তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ১৮-২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষিক্ত ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়;
- বাচ্চা/রেণু পোনার কুসুমথলি ২/৩ দিনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে শেষ হলে প্রাকৃতিক খাদ্য গ্রহণ শুরু করে।

প্রণোদিত প্রজনন

হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়েও কৈ মাছের প্রজনন করানো যায়। বর্তমানে অনেক সরকারী-বেসরকারী হ্যাচারিতে কৈ মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন সফলতা লাভ করেছে। পুরুষ কৈ মাছের তুলনায় স্ত্রী কৈ মাছ আকারে কিছুটা বড় হয়। একটি ৮০-১০০ গ্রাম ওজনের কৈ মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৬,০০০- ৮,০০০ এর মধ্যে হয়ে থাকে।

- ব্রুড প্রতিপালন : উন্নত মানের পোনা উৎপাদনের জন্য প্রজনন ঋতুর ৩-4 মাস আগে থেকেই প্রাকৃতিক/উপযুক্ত উৎস থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করে মজুদ পুকুরে রেখে ৩০-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ খাবার মাছের দেহ ওজনের ৩-৫% হারে প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে শতাংশ প্রতি ৪-৫ কেজি গোবর এবং ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে নিয়মিতভাবে জাল টেনে মাছের

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। প্রজননকালে স্ত্রী কৈ মাছের গায়ের রং হালকা বাদামি ও বক্ষ পাখনা উজ্জল বাদামি বর্ণ ধারণ করে;

- প্রজননের জন্য ইনজেকশন দেয়ার অন্ততঃ ৬ ঘন্টা পূর্বে ব্রুড মাছ পুকুর থেকে সতকর্তার সাথে পরিবহণ করে হ্যাচারিতে এনে সিস্টানে রেখে পানির ফোয়ারা দিতে হবে;
- প্রজননের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয় মাছকে একটি করে হরমোন ইনজেকশন দিতে হয়। স্ত্রী মাছকে ৬-৮ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি হারে ও পুরুষ মাছকে ২-৩ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি হারে ইনজেকশন দেয়ার পর পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে ১:১ অনুপাতে হাপায় রেখে পানির কৃত্রিম ঝর্ণা প্রবাহ দিতে হবে;
- সাধারণত ইনজেকশন দেয়ার ৬ ঘন্টা পর মাছ ডিম দিয়ে থাকে। ডিম ছাড়ার পর যত দ্রুত সম্ভব ব্রুড মাছগুলোকে সর্তকতার সংগে হাপা থেকে সরিয়ে ১ পিপিএম মাত্রায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবনে গোসল করিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে;
- সাধারণত ২২-২৪ ঘন্টা পর ডিম ফুটে রেণু পোনা বের হয়;
- রেণুগুলোকে সিমেন্ট সিস্টার্ন বা মেটাল ট্রেতে স্থানান্তর করতে হবে এবং রেণুর ডিম্বথলি নিঃশেষিত হওয়ার পর খাবার হিসেবে ১-২ দিন ডিমের কুসুম/টিউবিফেক্স/আর্টিমিয়া খাওয়াতে হবে।

পোনা প্রতিপালন

- কৈ মাছের পোনা প্রতিপালনের জন্য নার্সারি পুকুরের আয়তন ২৫-৩০ শতাংশ এবং গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভাল হয়;
- যথাযথ উপায়ে নার্সারি পুকুর প্রস্তুত পূর্বক প্রতি শতাংশে ৭,০০০-৮,০০০ টি পোনা (৫-৭ দিন বয়স) মজুদ করা যেতে পারে হবে;
- সাপ, ব্যাঙ, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি রোধে পুকুরের চারপাশে ১ মিটার উচ্চতায় নাইলন নেট স্থাপন করতে হবে;
- প্রথম ২৫ দিন পোনার দেহ ওজনের দ্বিগুন হারে ২০-২৫% আমিষ যুক্ত বাণিজ্যিক নার্সারি খাবার দিতে হবে;
- বরাদ্দকৃত খাবার দিনে ৩-৪ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে;
- পোনা নার্সারি পুকুরে ২৫-৩০ দিন প্রতিপালনের পর চাষের পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত হবে।

২। মাগুর মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

মাগুর আঁইশবিহীন জিওল মাছ, দেহ লালচে বাদামি বা ধূসর কালো, সাধারণত ২০-৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয় । মাগুর মাছে অতিরিক্ত শ্বসনযন্ত্র থাকার ফলে দীর্ঘক্ষণ পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। খাল, বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাঁওড়, পুকুর দিঘী, ডোবা- নালা এবং নিমজ্জিত ধানক্ষেত মাগুর মাছের প্রধান আবাসস্থল। স্রোতহীন আবদ্ধ পানিতে আগাছা, নল- খাগড়া, কচুরিপানায় এবং পচা ডাল-পালা যুক্ত জলাশয়ে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। মাগুর মাছ সাধারণত সর্বভূক (omnivorous) এবং জলাশয়ের তলায় বসবাস করে।

প্রাকৃতিক প্রজনন

- মাগুর মাছ এক বছরের মধ্যেই পরিপক্কতা লাভ করে এবং বছরে একবার প্রজনন করে থাকে। একই বয়সের স্ত্রী মাগুর মাছ পুরুষ মাগুর মাছের তুলনায় কিছুটা আকারে বড় হয়। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন সম্পন্ন করে;
- প্রজননকাল মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত। তবে জুন- জুলাই মাসে সর্বানুকুল প্রজনন কাল হিসেবে বিবেচিত;
- প্রজননের সময়ে নতুন পানি আসার সাথে সাথেই এরা মাইগ্রেট করে নিকটবর্তী ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, প্লাবনভূমির ঝোঁপ-ঝাড় এলাকায় যায় এবং সেখানে মাটিতে গোলাকার গর্ত করে তাতে ডিম ছাড়ে;
- মাগুর মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা দৈহিক ওজনের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত ৮০ থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের মাগুর মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৭,০০০-১০,০০০ টি;

- মাগুরের পরিপক্ক ডিম হালকা সবুজ থেকে তামাটে বর্ণের হয়ে থাকে। নিষিক্ত ডিম আঠালো এবং গাছের ডাল-পালা ও আগাছায় লেগে থাকে;
- ১৮-২০ ঘন্টা পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে কুসুম থলি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর টিউবিফিসিড ওয়ার্মস ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড় খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ও দৈহিক বৃদ্ধি হয়।

প্রণোদিত প্রজনন

হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়েও মাগুর মাছের প্রজনন করানো যায়। বর্তমানে অনেক সরকারী-বেসরকারী হ্যাচারিতে মাগুর মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন সফলতা লাভ করেছে।

- ব্রুড প্রতিপালনঃ উন্নত মানের পোনা উৎপাদনের জন্য প্রজনন ঋতুর ৩-৪ মাস আগে অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সুস্থ-সবল ব্রুড মাছ সংগ্রহ করতে হবে। মজুদ পুকুরে প্রতি শতাংশে ৬০-৮০ টি মাছ রেখে ৩০-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ সম্পুরক খাবার মাছের দেহ ওজনের ৪-৫% হারে প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে শতাংশ প্রতি ৭-৮ কেজি গোবর এবং ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে নিয়মিতভাবে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে;
- প্রজননের জন্য ইনজেকশন দেয়ার অন্ততঃ ৬ ঘন্টা পূর্বে ব্রুড মাছ পুকুর থেকে সতকর্তার সাথে পরিবহন করে হ্যাচারিতে এনে সির্স্টানে রেখে পানির ফোয়ারা দিতে হবে;
- স্ত্রী মাছকে প্রতি কেজিতে ২ মিলি ওভাপ্রিম অথবা ২ মিলি সুপ্রিম অথবা ৮০-১১০ মিলিগ্রাম পিজি একবার প্রয়োগ করতে হয়। পুরুষ মাছকে প্রতি কেজিতে ১ মিলি ওভাপ্রিম/সুপ্রিম অথবা ৩০-৪০ মিলিগ্রাম পিজি একবার হরমোন হিসাবে প্রয়োগ করতে হয়;
- ইনজেকশন দেয়ার ১২-১৬ ঘন্টা পর মাছ ডিম দিয়ে থাকে;
- পুরুষ মাছের পেট কেটে শুক্রাশয় বের করে ০.৯% লবন দ্রবণে মিশিয়ে শুক্রানুর দ্রবণ তৈরী করা হয়;
- স্ত্রী মাছের পেটে চাপ দিয়ে ডিম বের করা হয় এবং শুক্রানু দ্রবণের সাথে মিশিয়ে ডিম নিষিক্ত করা হয়;
- নিষিক্ত ডিম মেটাল ট্রে/সিমেন্ট সিস্টার্নে ভালভাবে ছড়িয়ে দিয়ে ঝর্ণা আকারে পানি প্রবাহের সৃষ্টি করতে হয়;
- তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে ২৪-৩০ ঘন্টা পর ডিম ফুটে লার্ভি বের হয়;
- ডিম ফুটার ২-৩ দিন পর রেণুকে ডিমের কুসুম/আর্টিমিয়া/টিউবিফেক্স খাবার হিসাবে দিতে হয়।

পোনা প্রতিপালন

- মাগুর মাছের পোনা প্রতিপালনের জন্য নার্সারি পুকুরের আয়তন ২৫-৩০ শতাংশ এবং গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভাল হয়;
- সঠিক পদ্ধতিতে নার্সারি পুকুর প্রস্তুত করার পর প্রতি শতাংশে ৮,০০০-১০,০০০ টি পোনা (৫-৭ দিন বয়স) মজুদ করা যেতে পারে হবে;
- সাপ, ব্যাঙ, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি রোধে পুকুরের চারপাশে ১ মিটার উচ্চতায় নাইলন নেট স্থাপন করতে হবে;
- প্রথম ২৫ দিন পোনার দেহ ওজনের দ্বিগুন হারে ২০-২৫% আমিষ যুক্ত বাণিজ্যিক নার্সারী খাবার দিতে হবে;
- নার্সারি পুকুরে পোনাকে প্রথম ২-৩ দিন টিউবিফেক্স সরবরাহ করতে হবে, পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক খাবারে অভ্যস্ত করতে হবে;
- বরাদ্দকৃত খাবার দিনে ২-৩ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে;
- পোনা নার্সারি পুকুরে ২৫-৩০ দিন প্রতিপালনের পর চাষের পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত হবে।

৩। শিং মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

শিং মাছ আঁইশবিহীন লম্বাটে জিওল মাছ, বর্ণ বাদামি লাল, সাধারণত ২০-৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়, অতিরিক্ত শ্বসনযন্ত্র থাকার ফলে দীর্ঘক্ষণ পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। খাল, বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাঁওড়, পুকুর, ডোবা-নালা, নিমজ্জিত ধানক্ষেত ইত্যাদি এলাকায় শিং মাছের প্রধান আবাসস্থল। এ ছাড়া কর্দমাক্ত তলার মাটিতে, গর্তে নিমজ্জিত গাছের গুড়ির তলায় বা সুড়ঙ্গে এরা বসবাস করতে পছন্দ করে। শিং মাছ আগাছা, দল, কচুরিপানা, পঁচা লতা-পাতা, ডাল-পালা অধ্যুষিত জলাশয়ে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। শিং মাছ সাধারণত সর্বভূক (omnivorous), জলাশয়ের তলার খাদ্য খেয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক প্রজনন

- শিং মাছ প্রথম বছরেই পরিপক্কতা লাভ করে এবং বছরে একবার প্রজনন করে থাকে। একই বয়সের স্ত্রী শিং মাছ পুরুষ মাছের তুলনায় কিছুটা আকারে বড় হয়। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন সম্পন্ন করে;
- প্রজননকাল মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত। তবে জুন-জুলাই মাসে সর্বানুকুল প্রজনন কাল হিসেবে বিবেচিত;
- প্রজননের সময়ে নুতন পানি আসার সাথে সাথেই নিকটবর্তী ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, প্লাবনভূমির ঝোঁপ-ঝাড় এলাকায় যায় এবং সেখানে মাটিতে গোলাকার গর্ত করে তাতে ডিম ছাড়ে;
- শিং মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা দৈহিক ওজনের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত: দেহের আকৃতির উপর নির্ভর করে ডিম ধারণ ক্ষমতা ৪,০০০-১৫,০০০ টি।
- পরিপক্ক ডিম হালকা তামাটে বর্ণের হয়। নিষিক্ত ডিম আঠালো এবং গাছের ডাল-পালা ও আগাছায় লেগে থাকে;
- ১৮-২০ ঘন্টা পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে কুসুম থলি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর টিউবিফিসিড ওয়ার্মস ও ক্ষুদ্র জলজ পোকা-মাকড় খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং বৃদ্ধি পায়।

প্রণোদিত প্রজনন

বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে শিং মাছের প্রণোদিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন সফলতা লাভ করেছে।

- ব্রুড প্রতিপালন : প্রাকৃতিক/উপযুক্ত উৎস থেকে ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে সুস্থ-সবল ব্রুড মাছ সংগ্রহ করতে হবে। কম গভীরতার পুকুর (১-১.৫ মিটার) শিং মাছের ব্রুড লালনের জন্য বেশি উপযোগি। শতাংশ প্রতি ৫০-৮০ টি মাছ মজুদ করতে হবে এবং ২৫-৩০% আমিষ সমৃদ্ধ সম্পুরক খাবার মাছের দেহ ওজনের ৪-৫% হারে প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে শতাংশ প্রতি ৭-৮ কেজি গোবর এবং ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে নিয়মিতভাবে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে;
- মাছে হরমোন প্রয়োগের অন্ততঃ ৬ ঘন্টা পূর্বে ব্রুড মাছ পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সতর্কতার সাথে হ্যাচারিতে এনে সিস্টানে রাখতে হবে এবং পানির ফোয়ারা দিতে হবে;
- স্ত্রী মাছকে প্রতি কেজিতে ২ মিলি ওভাপ্রিম/সুপ্রিম অথবা ৬০-৭০ মিলিগ্রাম পিজি একবার প্রয়োগ করতে হয়। পুরুষ মাছকে প্রতি কেজিতে ১মিলি ওভাপ্রিম/সুপ্রিম অথবা ৩০-৩৫ মিলিগ্রাম পিজি একবার প্রয়োগ করতে হয়;
- মাছকে ইনজেকশন দেয়ার পর পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে ১:১ অনুপাতে সিস্টার্ণে অথবা হাপাতে ছেড়ে দিতে হবে;
- ইনজেকশন দেয়ার ৮-১০ ঘন্টা পর মাছ ডিম দিয়ে থাকে। ডিম দেয়ার পর ব্রুড মাছগুলোকে সর্তকর্তার সথে সিস্টার্ণ থেকে তুলে ১ পিপিএম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণে গোছল করিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে;
- নিষিক্ত ডিম মেটাল ট্রে/সিমেন্ট সিস্টার্নে ভালভাবে ছড়িয়ে দিয়ে ঝর্ণা আকারে পানি প্রবাহের সৃষ্টি করতে হবে;
- তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে ২০-২৪ ঘন্টা পর ডিম ফুটে বাচ্ছা বের হয়;
- ডিম ফুটার ২-৩ দিন পর রেণুকে ডিমের কুসুম/আর্টিমিয়া/টিউবিফেক্স খাবার হিসাবে দিতে হয়।

পোনা প্রতিপালন

- ২৫-৩০ শতাংশ আকার ও ১-১.৫ মিটার গভীরতার পুকুর শিং মাছের নার্সারি হিসাবে ব্যবহার করা ভাল;
- সঠিক পদ্ধতিতে নার্সারি পুকুর প্রস্তুত করার পর প্রতি শতাংশে ৮,০০০-১০,০০০ টি পোনা (১৫-২০ দিন বয়স) মজুদ করা যায়;
- এ সময় পুকুরের চারপাশে ১ মিটার উচু নাইলন জাল স্থাপন করে সাপ, ব্যাঙ, কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধ করা হয়;
- পোনার দেহ ওজনের দ্বিগুন হারে ২০-২৫% আমিষ যুক্ত বাণিজ্যিক নার্সারি খাবার দিতে হবে;
- বরাদ্দকৃত খাবার দিনে ২-৩ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে;
- পোনা নার্সারি পুকুরে ২৫-৩০ দিন প্রতিপালনের পর চাষের পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত হবে।

৪। বাটা মাছের প্রণোদিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

- ব্রুড প্রতিপালন : ভাঙ্গান বাটা বা রেবা মাছের প্রজননকাল এপ্রিল-আগষ্ট মাস। প্রজননের ৩-৪ মাস পূর্বে সুস্থ-সবল ব্রুড মাছকে ২৫% আমিষ সমৃদ্ধ সম্পুরক খাবার প্রয়োগে প্রতিপালন করতে হবে। খাবার হিসাবে চাউলের কুঁড়া, সরিষার খৈল, ফিশ মিল ও ভিটামিন একত্রে মিশ্রিত করে মাছের দেহ ওজনের ৩-৫% হারে দৈনিক ২-৩ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে শতাংশ প্রতি ৪-৫ কেজি গোবর এবং ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে নিয়মিতভাবে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে;
- বাটা মাছের প্রজননের জন্য হরমোন ইনজেকশন দেয়ার ৬-১০ ঘন্টা পূর্বে ব্রুড মাছ ধরে সতকর্তার সাথে হ্যাচারিতে সিমেন্ট সির্স্টানে স্থানান্তর করে পানির ফোয়ারা দিতে হবে;
- স্ত্রী ও পুরুষ উভয় মাছকে একবার করে হরমোন ইনজেকশন দিতে হয়। সাধারনত স্ত্রী মাছকে প্রতি কেজিতে ৪-৬ মিলিগ্রাম হারে এবং পুরুষ মাছকে ১-২ মিলিগ্রাম হারে পিজি দ্রবন হরমোন হিসেবে দেয়া হয়;
- ইনজেকশন দেয়ার পর পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে ১:১ অনুপাতে সিস্টার্ণে রেখে পানির কৃত্রিম প্রবাহ দিতে হবে;
- ইনজেকশন দেয়ার ৮-৯ ঘন্টা পর সাধারণত চাপ প্রয়োগ পদ্ধতি বা নিয়ন্ত্রিত পানি প্রবাহের প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মাছের ডিম সংগ্রহ করা হয়। ডিম দেয়ার পর ব্রুড মাছগুলোকে সর্তকর্তার সথে সিস্টার্ণ থেকে তুলে ১ পিপিএম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণে গোছল করিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে;
- নিষিক্ত ডিম হ্যাচারিতে ফানেল ইনকুবেটর বা বোতল জারে পানির প্রবাহ দেয় হয়;
- তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে ১৪-১৬ ঘন্টা পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়;
- ডিম ফুটার ২-৩ দিন পর রেণুকে ডিমের কুসুম খাবার হিসাবে দিতে হয়।

পোনা প্রতিপালন

- বাটা মাছের নার্সারি পুকুরের আয়তন ২৫-৩০ শতাংশ ও গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভাল হয়;
- সঠিক পদ্ধতিতে নার্সারি পুকুর প্রস্তুত করার পর প্রতি শতাংশে ১০,০০০-১৫,০০০ টি পোনা (৫-৭ দিন বয়স) মজুদ করা যায়;
- প্রাথমিকভাবে ৫ দিন রেণু পোনার মোট ওজনের দ্বিগুন হারে এবং পরবর্তী ৫ দিন অন্তর অন্তর পোনার মোট ওজনের যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৫% হারে বাণিজ্যিক নার্সারি খাবার অথবা সম্পুরক খাবার দিতে হয়;
- বরাদ্দকৃত খাবার দিনে ২-৩ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে;
- পোনা নার্সারি পুকুরে ২৫-৩০ দিন প্রতিপালনের পর চাষের পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত হয়।

৫। দেশী সরপুঁটি মাছের প্রণোদিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

- ব্রুড প্রতিপালন : সরপুঁটি মাছের সর্বানুকুল প্রজননকাল হচ্ছে এপ্রিল-জুন মাস। প্রজননের ৩-৪ মাস পূর্বে সুস্থ-সবল ব্রুড মাছকে ২৫-৩০% আমিষ সমৃদ্ধ সম্পুরক খাবার প্রয়োগে প্রতিপালন করতে হয়। খাবার হিসাবে চাউলের কুঁড়া, সরিষার খৈল, ফিশ মিল ও ভিটামিন প্রিমিক্স একত্রে মিশ্রিত করে মাছের দেহ ওজনের ৩-৫% হারে দৈনিক ২-৩ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। পুকুরে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে শতাংশ প্রতি ৪-৫ কেজি গোবর এবং ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হয় এবং নিয়মিতভাবে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়;
- সরপুঁটি মাছের প্রজননের জন্য হরমোন প্রয়োগের ৬-১০ ঘন্টা পূর্বে ব্রুড মাছ ধরে সতকর্তার সাথে হ্যাচারিতে সিমেন্ট সির্স্টানে স্থানান্তর করে পানির ফোয়ারা দিতে হবে;
- প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয় মাছকে একটি করে হরমোন ইনজেকশন দিতে হয়। সাধারণত স্ত্রী মাছকে প্রতি কেজিতে ৬-৭ মিলিগ্রাম হারে এবং পুরুষ মাছকে ২ মিলিগ্রাম হারে পিজি দ্রবন প্রয়োগ করা হয়;
- হরমোন প্রয়োগের পর পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে ১:১ অনুপাতে সিস্টার্ণে রেখে পানির কৃত্রিম প্রবাহ দিতে হবে;
- ইনজেকশন দেয়ার ৬-৭ ঘন্টা পর স্ত্রী মাছ ডিম দেয়। সাধারণত পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মাছের ডিম সংগ্রহ করা হয়। ডিম দেয়ার পর ব্রুড মাছগুলোকে সর্তকর্তার সাথে ১ পিপিএম মাত্রায় পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণে গোছল করিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে;
- নিষিক্ত ডিম হ্যাচারিতে ফানেল ইনকুবেটর বা বোতল জারে পানির প্রবাহ দেয়া হয়;
- তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে সাধারণত ১৮-২০ ঘন্টা পর ডিম ফুটে বাচ্ছা বের হয়;
- ডিম থেকে রেণু বের হওয়ার পর হাপাতে ২-৩ দিন রাখতে হয়। অতঃপর রেণুর ডিমথলি নিঃশেষিত হওয়ার পর খাবার হিসেবে রেণুকে মুরগীর ডিমের কুসুম দিতে হয়।

পোনা প্রতিপালন

- পোনা প্রতিপালনের জন্য আতুর পুকুরের আয়তন ২৫-৩০ শতাংশ ও গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভাল হয়;
- সঠিক পদ্ধতিতে নার্সারি পুকুর প্রস্তুত করার পর প্রতি শতাংশে ১০,০০০-১৫,০০০ টি পোনা (৫-৭ দিন বয়স) মজুদ করা যায়;
- প্রাথমিকভাবে ৫ দিন রেণু পোনার মোট ওজনের দ্বিগুন হারে এবং পরবর্তী ৫ দিন অন্তর অন্তর পোনার মোট ওজনের যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৫% হারে বাণিজ্যিক নার্সারি খাবার অথবা সম্পুরক খাবার দিতে হয়;
- বরাদ্দকৃত খাবার দিনে ২-৩ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে;
- পোনা নার্সারি পুকুরে ২৫-৩০ দিন প্রতিপালনের পর চাষের পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত হয়।

৬। পাবদা ও গুলশা মাছের প্রণোদিত প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল

- ব্রুড প্রতিপালনঃ পাবদা ও গুলশা মাছের প্রজননকাল জুন-জুলাই মাস। উন্নতমানের পোনা উৎপাদনের জন্য প্রজনন ঋতুর ৩-৪ মাস আগে থেকেই প্রাকৃতিক উৎস থেকে ব্রুড মাছ সংগ্রহ করে শতাংশ প্রতি ৬০-৮০টি মজুদ করা যেতে পারে। খাবার হিসাবে এসময় ৩০% আমিষ সমৃদ্ধ সম্পুরক খাবার মাছের দেহ ওজনের ৩-৫% হারে দৈনিক ২-৩ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে শতাংশ প্রতি ৪-৫ কেজি গোবর এবং ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে নিয়মিতভাবে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে;
- প্রণোদিত প্রজননের জন্য হরমোন প্রয়োগের ৬-১০ ঘন্টা পূর্বে ব্রুড মাছ পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সতর্কতার সাথে হ্যাচারিতে সিমেন্ট সির্স্টানে রেখে পানির ফোয়ারা দিতে হবে;
- নিম্নে পাবদা ও গুলশা মাছের প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে হরমোনের মাত্রা উল্লেখ করা হলো :

প্রজনন কার্যক্রম	পাবদা	গুলশা

ইনজেকশন প্রয়োগ	২ বার	১ বার
হরমোন মাত্রা	**১ম ডোজঃ** স্ত্রী: ৩-৪ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি পুরুষ: ৪-৬ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি **২য় ডোজ**: ৬ ঘন্টা পর স্ত্রী: ১২-১৬ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি পুরুষ: ৬-৮ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি	স্ত্রী: ৮-১২ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি পুরুষ: ৪-৬ মিলিগ্রাম পিজি/কেজি

- উভয় মাছই হরমোন প্রয়োগের পর ১:১ অনুপাতে হাপা/সিস্টার্ণে রেখে পানির কৃত্রিম প্রবাহ সৃষ্টি করা হয় যাতে মাছ প্রজননের জন্য প্রণোদিত হয়;
- হরমোন প্রয়োগের ৮-১০ ঘন্টা পর ডিম দিয়ে থাকে;
- ডিম দেয়ার পর ব্রুড মাছগুলোকে সর্তকর্তার সথে হাপা/সিস্টার্ণ থেকে তুলে ১ পিপিএম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণে গোছল করিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে;
- তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে ১৮-২২ ঘন্টা পর ডিম ফুটে রেণু পোনা বের হয় এবং কুসুম থলি নিঃশেষিত হওয়া পর্যন্ত হাপা/সিস্টার্ণে রাখতে হয়;
- কুসুমথলি নিঃশেষিত হওয়ার পর রেণুকে সিস্টার্ণে স্থানান্তর করে প্রথম ১-২ দিন ডিমের কুসুম দিতে হবে এবং পরবর্তী ৮-১০ দিন খাদ্য হিসাবে জুপ্ল্যাঙ্কটন/আর্টিমিয়া নপ্লি সরবরাহ করতে হয়।

পোনা প্রতিপালন

- পাবদা ও গুলশার নার্সারি পুকুরের আয়তন ৫-১০ শতাংশ ও গভীরতা ১ মিটার হলে ভাল হয়।
- পুকুর প্রস্তুতির সময় প্রাকৃতিক খাবার (বিশেষতঃ জুপ্ল্যাঙ্কটন) উৎপাদনের জন্য শতাংশ প্রতি ২০ কেজি হারে গোবর প্রয়োগ করতে হয়;
- যথাযথভাবে নার্সারি প্রস্তুত করার পর প্রতি শতাংশে ৮-১০ দিন বয়সের ৩,০০০-৪,০০০ টি পাবদা/গুলশা মাছের পোনা মজুদ করা যায়;
- পোনা ছাড়ার পর পোনার মোট ওজনের ১২-১৫% হারে সম্পুরক খাবার (৪০% চালের কুড়া, ৩০% সরিষার খৈল ও ৩০% ফিশমিল এর মিশ্রণ) অথবা বাণিজ্যিক নার্সারি খাবার প্রদান করতে হবে;
- বরাদ্দকৃত খাবার দিনে ২-৩ বারে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে;
- নার্সারি পুকুরে প্রতিপালনে পোনার ওজন ২.০-২.৫ গ্রাম হলে তা চাষ পুকুরে ছাড়তে হবে।

৭। চাষের পুকুরে মলা ও পুঁটি মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন

মলা ও পুঁটি মাছের প্রণোদিত প্রজনন করা হয় না কেননা প্রাকৃতিক জলাশয়, পুকুর-ডোব হতে এ সকল মাছ সহজেই পাওয়া যায়। এদের ব্রুড মাছ সরাসরি চাষের পুকুরে মজুদ করে প্রাকৃতিকভাবে পোনা উৎপাদন করা যায় এবং একবার মজুদ করলেই পরবর্তীতে চাষের জন্য আর পোনা মজুদ করার প্রয়োজন হয় না।

ব্রুড সংগ্রহ

প্রাকৃতিক উৎস্য অথবা আশেপাশের পুকুর হতে মলা ও পুঁটি মাছের ব্রুড সংগ্রহ করা যায়। ব্রুড ধরার সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, কারণ এ মাছগুলো খুবই নাজুক প্রকৃতির। এজন্য নরম সুতির বেড় জাল দ্বারা কম নাড়াচাড়া করে মাছ ধরা উচিত।

ব্রুড পরিবহন

ব্রুড হিসাবে স্থানান্তরের সময় খুব সাবধানতার সাথে পরিবহন করতে হবে, কেননা এ মাছগুলো খুব সহজেই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্ভব হলে অক্সিজেন ব্যাগে ২০০টি করে ব্রুড পরিবহন করতে হবে। ব্রুড মাছের উৎস কাছাকাছি হওয়া ভাল যাতে করে ২-৩ ঘন্টার মধ্যেই চাষের পুকুরে ব্রুড মজুদ করা যায়। কম দূরত্বের ক্ষেত্রে পাতিলেও ব্রুড মাছ পরিবহন করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে ৩০ লিটার পানিতে ১ প্যাকেট ওরস্যালাইন এর ১/৪ ভাগ ভাল ভাবে মিশিয়ে ১৫০-১৭০ টি ব্রুড পরিবহন করা যায়।

মজুদ ঘনত্ব

মলা ও পুঁটি মাছ ব্রুড হিসাবে সংগ্রহ করার পর কার্প মিশ্র চাষের পুকুরে প্রতি শতাংশে ৫০টি মলা ও ৫০টি পুঁটি মজুদ করতে হয়।

প্রাকৃতিকভাবে চাষের পুকুরে মলা ও পুঁটির বংশ বৃদ্ধিতে করণীয়

- চাষের পুকুরে মলা ও পুঁটি মাছের বংশ বৃদ্ধির সুবিধার্থে পুকুরের পাড়ে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জলজ আগাছা (কলমি, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ ইত্যাদি) রাখতে হবে;
- পুকুরে ব্রুড মজুদের ১৫-৩০ দিনের মধ্যে জলজ আগাছায় প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করে এবং এসময় প্রচুর পরিমান পোনা ভাসমান অবস্থায় পানির উপরিভাগে দেখা যায়। এ অবস্থায় পুকুরে কোনভাবেই জাল টানা যাবে না। পোনাকে খাদ্য হিসাবে চালের মিহি কুড়া শুকনা অস্থায় পুকুরের উপরিভাগে ছিটিয়ে দিতে হবে;
- ব্রুড মজুদের অল্প সময়ের মধ্যেই পোনার সংখ্যা অত্যাধিক হারে বেড়ে যায়। এ অবস্থায় মলা/পুঁটি বড় হলে (৩-৪ সেমি.) ১৫ দিন অন্তর অন্তর আংশিক আহরণ করা অত্যাবশ্যক;

ছোট মাছের পোনা সংগ্রহ, পরিবহণ ও শোধন

ছোট মাছের পোনা পরিবহন রুই জাতীয় পোনা পরিবহনের মত হলেও একটু ভিন্নতা রয়েছে। ছোট মাছের মধ্যে কৈ, শিং-মাগুর পাবদা, গুলশা ইত্যাদি মাছ কাটাযুক্ত হওয়ায় বড় আকারের পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। শিং-মাগুর পাবদা, গুলশা ইত্যাদি ছোট পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহণ করাই উত্তম।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের পোনা নাসারি পুকুরে ২৫-৩৫ দিন প্রতিপালনের পর যখন কৈ মাছের পোনাগুলো ২.৫- ৩ সেমি. আকারের হয় তখন মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করতে হয়। উৎসস্থল থেকে মজুদ পুকুরের দুরত্ব যতকম হয় পোনার মৃত্যু হার তত কম হয়। বেশি দুরত্বে পরিবহণের ক্ষেত্রে মৃত্যু হার বেশি হয়। যে কোন উৎস থেকে সংগ্রহ ও পরিবহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপঃ

১) **সনাতন পদ্ধতিঃ** এ পদ্ধতিটি সনাতন হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পোনা পরিহনের এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে রেণু (Spawn) পরিবহণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যবহার খুবই কম। এ পদ্ধতিতে এ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বা ড্রামের মাধ্যমে পোনা পরিবহন করতে হয়। পোনা পরিবহনের পূর্বে অবশ্যই পোনা টেকসই করে নিতে হবে। টেকসই করণের পর পোনা পরিবহণ উপযোগি হলে পরিমাণ মত নলকুপ/নদী/ পুকুরের পরিস্কার ঠান্ডা পানি নিতে হবে। এ পদ্ধতিতে সাধারণত: ২০-৩০টি পোনা/লিটার ঘনত্বে পরিবহণ করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে এ পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের হার নিম্নরূপ (৬-৮ ঘন্টার ভ্রমনে):

পাতিলের মাধ্যমে

- কৈ মাছ - ১০০০-১৫০০টি (৮-১২ লি: পানি)
- শিং ও মাগুর- ১০০০-২০০০টি (৮-১২ লি: পানি)
- পাবদা ও গুলশা ১০০০-১৬০০টি (৮-১২ লি: পানি)

ড্রামের মাধ্যমে

- কৈ- গড় ওজন ০.২- ০.৩ গ্রাম হলে ৭-৮ হাজার প্রতি ড্রামে।
- কৈ গড় ওজন ০.৪-০.৫ গ্রাম হলে ৫-৬ হাজার প্রতি ড্রামে।
- শিং ও মাগুর- ৪০০০- ৬০০০টি প্রতি ড্রামে।

উল্লেখযোগ্য যে শিং এবং মাগুর মাছের পোনা ড্রামে/পাতিলে পরিবহণ না করাই ভাল। কারণ দু’টো মাছই তলদেশী। ফলে বুকে ঘসা লেগে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং পরে পোনা ইনজেকশন হওয়ার কারণে মারা যায়।
এ পদ্ধতিতে পোনা পরিবহণ কালে পাতিল/ ড্রামে মুখ ভেজা পাতলা কাপড় বা মশারীর জাল দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। এক্ষেত্রে পাতিল/ড্রামের পানিতে হাত দিয়ে বা ঝাঁকিয়ে বাতাসের অক্সিজেন মিশাতে হয় এবং ৪/৫ ঘন্টা পর পর পানি বদলাতে হয়। পোনা পরিবহণকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ড্রাম/পাতিলের পানি অত্যাধিক গরম না হয়।

২) আধুনিক পদ্ধতি :

এ পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে পানি এবং অক্সিজেনসহ পোনাকে প্যাকেট করে পরিবহণ করা হয়। সাধারণত বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ৬৬ সেমি. x ৪৬ সেমি. আকারের পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহণ করা হয়। প্রতিটি প্যাকেটে ২টি করে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করাই উত্তম। কোন কারণে যদি একটি ব্যাগ ছিদ্র হয়ে যায় তবে দ্বিতীয়টি পানি, অক্সিজেন ও পোনা রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

পোনা প্যাকিং করার সময় সমান আকারের দুইটি পলিথিন ব্যাগ নিয়ে একটি অন্যটির ভিতর ঢুকিয়ে তার ১/৩ অংশ পানি দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং ব্যাগের উপরের অংশ এক হাত দিয়ে আটকিয়ে এবং অন্য হাত দিয়ে ব্যাগটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে হবে কোন ছিদ্র পথে পানি বেরিয়ে যায় কিনা। ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ পাওয়া গেলে তা পরিবর্তন করতে হবে।

নিম্নের নিয়ম অনুসারে পলিথিন ব্যাগে প্যাকেট করে পোনা পরিবহন করা উত্তম-

ব্যাগের আকার	পোনার প্রজাতি	দূরত্ব	বয়স	পরিমাণ
	কৈ	১৫-১৮ ঘন্টা	২০-২১ দিন	২৫০-৩০০ গ্রাম
	শিং	১৫-১৮ ঘন্টা	৩০-৪০ দিন	৩০০-৪০০ গ্রাম
	মাগুর	১৫-১৮ ঘন্টা	২৫-৩০ দিন	৩০০-৪০০ গ্রাম
	কৈ/শিং/মাগুর	৪-৬ ঘন্টা	২০-২৫ দিন	১.০-১.৫ কেজি
	পাবদা/গুলশা	১৫-১৮ ঘন্টা	২৫-৩০ দিন	২৫০-৩০০ গ্রাম
	মলা/পুটিব্রুড	৪-৬ ঘন্টা	-	২৫০-৩৫০টি

পলিথিনের ব্যাগের ১/৩ অংশে পানি ভরে তাতে প্রয়োজনীয় পরিমান পোনা রেখে পলিথিনের বাকী অংশে অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করে সুতলি / রাবার ব্যান্ড দিয়ে ভাল ভাবে বেঁধে নিতে হবে যাতে অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে না পারে। পোনা পরিবহণের জন্য পানির তাপমাত্রা ২২-২৭° সেলসিয়াস এর মধ্যে রাখা উচিত। পানির তাপমাত্রা বেশি হলে অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। পরিবহণকালে পলিথিন ব্যাগ যাতে ছিদ্র হতে না পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্ভব হলে পলিথিন ব্যাগ বস্তায় ভরে পরিবহণ করতে হবে।

৩) অন্যান্য পদ্ধতি

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও নিমেণাক্ত পদ্ধতিতে পোনা পরিবহণ করা যায়-

- ইনসুলেটিড ট্যাংকে এরেটরের সাহায্যে অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে পোনা পরিবহণ করা যায়;
- ক্যানভাস ট্যাংকের মাধ্যমে পিক-আপ বা অন্য কোন গাড়ী ব্যবহার করে এরেটরে সেট করে পোনা পরিবহণ করা যায়;
- আজকাল ভ্যান গাড়ীতে / টেম্পুতে মোটা পলিথিন শীট নিয়ে ক্যানভাস ট্যাংক তৈরি করেও পোনা পরিবহণ করতে দেখা যায়।

পোনা পরিবহণে সতর্কতাঃ

- একটি পাতিলে বা ড্রামে /ট্যাংকে/ব্যাগে একই আকারের পোনা পরিবহণ করা উচিত;
- পোনা পরিবহণ করার আগে পোনাকে পেট খালি করে কন্ডিশনিং করে নিতে হবে;
- দুর্বল পোনা পরিবহণ করা যাবে না;
- পরিবহণকালে সরাসরি নলকূপের পানি ব্যাগে/পাতিলে/ড্রামে/ট্যাংকে দেয়া উচিত নয়। এতে পোনা মারা যেতে পারে;
- প্রয়োজন হলে একই তাপমাত্রার ভাল পানি দিয়ে ব্যাগের বা পরিবহণ পাত্রের পানি বদলানো যেতে পারে;
- শিং ও মাগুর মাছের পোনা ড্রাম /পাতিলে পরিবহণকালে পেটের দিক থেকে ঘষা খেয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। তাই এগুলোকে ব্যাগে পরিবহণ করাই ভাল। ব্যাগে পরিবহণ করে পোনাকে অবশ্যই শোধন করে পুকুরে ছাড়তে হবে এবং কম পরিমাণ পোনা এক সাথে পরিবহণ করতে হবে;
- লোহার /প্লেনশীটের ড্রামের পরিবর্তে প্লাষ্টিক ড্রামে পোনা পরিবহণ করাই ভাল। তাতে ক্ষতি কম হয়।

পোনা শোধন ও প্রতিষেধক চিকিৎসাঃ

পোনা পরিবহণ করে খামারে নেওয়ার পর পুকুরে ছাড়ার পূর্বে পোনা শোধন করে নিতে হবে এবং এতে পোনা সুস্থ থাকবে এবং রোগ বালাই এর সম্ভাবনা কমে যাবে। পোনা নিম্নরূপেভাবে শোধন করা যাবে -

- একটি বালতিতে ১০লিটার পানি নিয়ে এর মধ্যে ২০০ গ্রাম খাবার লবন অথবা ১ চা চামচ ডাক্তারী পটাশ (KMno4) মিশাতে হবে;

- অত:পর বালতির উপর একটি ঘন জাল রেখে তার মধ্যে প্রতিবার ২০০-৩০০টি পোনা ছাড়তে হবে;
- তারপর জাল ধরে পোনাগুলোকে বালতির পানিতে ৩০ সেকেন্ড গোসল করাতে হবে ;
- এভাবে একবার তৈরি করা লবণ/ পটাশের পানিতে ৫-৭ বার শোধন করা যাবে।

ডাক্তারী পটাশ বা লবণ পানি দিয়ে পোনা শোধন ছাড়াও এটিন্টবায়েটিক দিয়ে পোনাকে পুকুরে ছাড়ার সাথে সাথেই রোগমুক্ত বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, যেমন-

- পুকুরে পোনা ছাড়ার পর Oxysaytin, Lenocide ইত্যাদি গ্রাম পজেটিভ, গ্রাম নেগেটিভ ব্যকটেরিয়া, ভাইরাস, ফ্যাংগাস, এ্যালজি ও প্রোটজোয়াজনিত মারাত্নক ক্ষতিকর রোগজীবানুগুলোকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন ঔষধ পাওয়া যায়।

Lenocide (তরল)	৫মিলি/শতক/২-৩ ফুট গভীরতা
Oxysentin 20%(পাউডার)	১০ গ্রাম পরিমান ঔষধ প্রতি ১০০ কেজি খাবারে মিশিয়ে ১০ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।
Renamycin(পাউডার)	প্রতি ১০ কেজি খাবারে ১ চা চামচ পরিমান ঔষধ খাবারে মিশিয়ে ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে।

মলা ও পুঁটির চাষ ব্যবস্থাপনা

চাষের গুরুত্ব

মলা-পুঁটি অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ মাছ। এসব মাছে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ভিটামিন রয়েছে। মলা-পুঁটি মাছ বিল হাওর-বাঁওড়, নদী, ধানক্ষেত, পুকুর ও ডোবায় পাওয়া যায়। প্রান্তিক মৎস্য চাষীরা পুকুর-ডোবা ও অন্যান্য জলাশয়ে সাধারণত রুইজাতীয় মাছ চাষ করে থাকে। তারা মলা-পুঁটি জাতীয় ছোট মাছকে অবাঞ্ছিত মাছ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। অথচ এখন পর্যন্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই প্রানিজ আমিষের জন্য নির্ভর করে খাল বিলের মলা-পুঁটিসহ অন্যান্য ছোট মাছের উপর। এ কারণে পুকুর ডোবায় এসব ছোট মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাৎসরিক ও মৌসুমী উভয় প্রকার পুকুর-জলাশয়ে রুইজাতীয় মাছের সাথে মলা-পুঁটি একত্রে চাষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সহজেই অর্থ ও পুষ্টি দুই-ই লাভ করতে পারে। মলা-পুঁটি বছরে ২-৩ বার প্রাকৃতিকভাবে ডিম দেয়। এ কারণে পোনা কেনার জন্য বাড়তি পুঁজির দরকার হয় না। এসব মাছ অল্প সময়ে আহরণ করা যায়। যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চাষ করা হলে পুকুরে রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন ঠিক রেখে মলা-পুঁটি মাছের বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায়। মলা-পুঁটি মাছ কিছুদিন পর পর পুকুর থেকে ধরে পরিবারে প্রয়োজনীয় মাছের চাহিদা পূরণ করা যায়। এসব মাছ অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেনযুক্ত ও ঘোলা পানিতে চাষ করা সম্ভব।

মলা ও পুঁটি মাছ চাষের উপযোগিতা

- বাজারে মলা ও পুঁটি মাছের চাহিদা বেশি তাই রুইজাতীয় মাছের সাথী ফসল হিসাবে এদের চাষ লাভজনক;
- মলা ও পুঁটি মাছ ছোট-বড় সব ধরণের পুকুর জলাশয়ে চাষ করা সম্ভব;
- পুকুর-নদীতে এ মাছ বছরে দু'বার ডিম দেয় বলে এদের পোনা মজুদের প্রয়োজন হয় না;
- ১৫-২০ দিন পর পর পুকুর থেকে মলা মাছ ধরে পরিবারের মাছের চাহিদা পুরণ করা যায়;
- পুঁটি মাছের চ্যাপা শুটকী গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের প্রিয় খাবার;
- পুকুরে রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন ঠিক রেখেও মলা ও পুঁটি মাছের বাড়তি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

মলা ও পুঁটির চাষ ব্যবস্থাপনা

মলা ও পুঁটির একক বা মিশ্রচাষ করা যায়। নিম্নে একক ও মিশ্রচাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

মলা ও পুঁটির একক চাষ

পুকুর নির্বাচন

- মলা বা পুঁটি মাছের একক চাষের জন্য বাৎসরিক বা মৌসুমী পুকুর নির্বাচন করা যেতে পারে ;
- পুকুরের আয়তন ১০-১৫ শতক এবং গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার থাকা আবশ্যক;
- পুকুর পাড়ে বড় গাছপালা না থাকা বাঞ্চনীয়;
- প্রয়োজনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা, এতে পরিপক্ক মাছের প্রজনন ঘটানো সহজতর হয়;
- আয়াতাকার পুকুর যেখানে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও অবাধ বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে;

পুকুর প্রস্তুতি

- বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দূর করতে হবে। পুকুর শুকিয়েও রাক্ষুসে মাছ দূর করা যায়;
- প্রতি শতকে ১.০-১.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে;
- প্রতি শতকে ৫-৭ কেজি হারে গোবর দিতে হবে। পানির রং সবুজাভ হলে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা মজুদ

- মলা বা পুঁটি মাছ অত্যন্ত নাজুক বিধায় পরিবহনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সকালে বা বিকালে কম তাপমাত্রায় মাছ পরিবহন করা ভালো;
- বড় আকারের (৫-৭ সেমি.) পরিপক্ক মলা বা পুঁটি মাছ ছেড়ে এই মাছের একক চাষ করা যেতে পারে;
- এপ্রিল-মে মাসে মলা ও পুঁটি মাছ ডিম ছাড়ে। এ সময় প্রাকৃতিক উৎস যেমন- খাল-বিল বা বড় পুকুর হতে মলা-পুঁটির ব্রুড সংগ্রহ করে চাষের পুকুরে মজুদ করতে হবে;
- প্রতি শতকে ৪০০টি মলা বা পুঁটি মাছ মজুদ করতে হয়।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি

- মাছ ছাড়ার পরদিন হতে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে;
- মাছের দেহের মোট ওজনের ৫% হারে চালের কুড়া/গমের ভূষি (৮০%) ও সরিষার খৈল (২০%) এর মিশ্রণ তৈরি করে পুকুরে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে;
- প্রতি মাসে মাছের নমুনায়ন করে খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারন করতে হবে।

সার প্রয়োগ

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য ৭ দিন অন্তর প্রতি শতকে ৫-৬ কেজি গোবর সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পুকুরে উৎপাদনশীলতা ও ঋতুভেদে সার প্রয়োগের হার কম বেশি হতে পারে।

মাছ আহরণ

- মলা/ পুঁটি মাছ মজুদ করার ১-২ মাসের মধ্যে (এপ্রিল-মে) পুকুরে প্রাকৃতিক প্রজনন করে থাকে। বছরে এরা ২ বার ডিম দেয় (মে ও অক্টোবর)। মাছ মজুদের ২ মাস পর ঘন ফাঁসের জাল টেনে পোনা ধরার ব্যবস্থা নিতে হবে। পুঁটি মাছ ধরার জন্য ঝাঁকি জাল ব্যবহার করতে হবে। মাছ মজুদের ২ মাস পর থেকে প্রতি ১৫ দিন পর পর মাছ আহরণ করতে হবে;
- ছয় মাস পর পুকুরের পানি শুকিয়ে সমস্ত মাছ ধরা যেতে পারে।

উৎপাদন

মলা ও পুঁটি মাছের ৬ মাসে উৎপাদন যথাক্রমে প্রতি একরে ১২০০-১৫০০ ও ১৫০০-২০০০ কেজি।

রুই জাতীয় মাছের সাথে মলা ও পুঁটির মিশ্রচাষ

পুকুর নির্বাচন

- দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ মাটির পুকুর মিশ্রচাষের জন্য ভাল;
- মিশ্রচাষের জন্য পুকুরের আয়তন ২০ শতকের বড় এবং পানির গড় গভীরতা ৫-৭ ফুট থাকা উত্তম;
- পুকুর আয়াতাকার হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হয়;
- পুকুর বন্যা মুক্ত এলাকায় হতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতি

- পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড় ও বড় গাছপালা ছেটে দিতে হবে যাতে পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়তে পারে;
- পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা (১ ফুটের বেশি) থাকলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে;
- বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দমন করতে হবে;
- প্রতি শতকে ১.০-১.৫ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে;
- প্রতি শতকে ৫-৭ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

- পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মেছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে পোনা ছাড়তে হবে;
- বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে মলা ও পুঁটি সংগ্রহ করে মজুদ করতে হবে। যাতে এরা মজুদ পুকুরে ডিম ছেড়ে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে;
- সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুরে মলা ও পুঁটি একবার মজুদ করলেই চলে। এরা পুকুরের কিনার ঘেঁষে ভাসমান লতা-পাতায় ডিম ছাড়ে। তাই প্রজননের ২০-২৫ দিন পর পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে ভাসতে দেখা যায়, এ সময় জাল টানা উচিত নয়। এতে পোনা মাছের ক্ষতির আশংকা থাকে;

- শতক প্রতি পোনার মজুদ ঘনত্ব নিম্নরূপ-

মডেল-১			মডেল-২	
মাছের প্রজাতি	পোনার সংখ্যা	পোনার আকার (ইঞ্চি)	পোনার সংখ্যা	পোনার আকার (ইঞ্চি)
রুই	১৩	৪-৫	১৩	৪-৫
কাতলা	১৩	৪-৫	৬	৪-৫
মৃগেল/কার্পিও	১৪	৪-৫	১৩	৪-৫
সিলভার কার্প	-	-	৬	৪-৫
গ্রাস কার্প	-	-	২	৪-৫
মলা	১০০	-	১০০	-
পুঁটি	১০০	-	১০০	-
সর্বমোট	২৪০	-	২৪০	-

পোনা অভ্যস্তকরণ ও মজুদ

- পোনা পরিবহনের ব্যাগ/হাড়ি প্রথমেই ২০-৩০ মিনিট পানিতে ভাসিয়ে রেখে তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে;
- তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত পাত্রের কিছু পানি পুকুরে এবং পুকুরের কিছু পানি পাত্রে দিতে হবে;
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ পানিতে কাত করে ডুবিয়ে পানির স্রোত দিলে পোনা দল বেঁধে স্রোতের বিপরীত দিকে বেরিয়ে যাবে;

অতিরিক্ত পোনা মজুদের কুফল

- মাছের খাদ্য, অক্সিজেন ও আবাসস্থলের ঘাটতি হয়;
- মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় না;
- মাছ বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হয়;
- মাছকে সকালে খাবি খেতে দেখা যায় এবং অনেক সময় মাছ মারা যায়;
- অপুষ্টির কারণে মাছের মাথা মোটা ও শরীর চিকন হতে দেখা যায়;
- সার ও খাবার ব্যবহার করার পরও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

খাদ্য প্রয়োগ

- প্রতিদিন পুকুরে মাছকে বাইরে থেকে খাবার দেয়া প্রয়োজন;
- মাছ ছাড়ার পরের দিন হতে রুইজাতীয় মাছের ওজনের ৩-৪% হিসাবে চালের কুঁড়া/গমের ভূষি ও সরিষার খৈল ২:১ অনুপাতে মিশিয়ে পুকুরে দিতে হবে। মলা ও পুঁটির জন্য বাড়তি খাবার দেয়ার প্রয়োজন নেই;
- গ্রাস কার্পের জন্য কলাপাতা বা নরম ঘাস দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

- পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য (প্লাঙ্কটন) জন্মানোর জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক;
- পোনা মজুদের পর হতে পানির রং পর্যবেক্ষণ করে ৭-১০ দিন পর পর প্রতি শতকে ৪-৫ কেজি গোবর সার, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে;
- প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সারের পরিমাণ কম-বেশি করা যাবে।

মাছ আহরণ ও বিক্রয়

- মলা ও পুঁটি মাছ বছরে ২-৩ বার ডিম দেয়। তাই ডিম ছাড়ার ১০-১৫ দিন অন্তর মলা মাছের আংশিক আহরণ জরুরী। আংশিক আহরণ না করলে মাছের ঘনত্ব বেড়ে যায় ও খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে;
- পোনা মজুদের ৬-৭ মাস পর রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন বা বাজার দর দেখে আংশিক আহরণ করে বাজারজাত করা যেতে পারে;
- আংশিক আহরণ করা পুকুরে শতকরা ২০ ভাগের অধিক হারে বড় আকারের পোনা মজুদ করতে হবে;
- কার্পের সাথে মলা ও পুঁটির চাষ করে চাষি দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়েও বাড়তি আয়ের সংস্থান করতে পারে;
- এ পদ্ধতিতে ৬-৭ মাসে প্রতি শতকে ১৫-২০ কেজি মাছের উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে।

আয়-ব্যয়

একক চাষ পদ্ধতিতে ৬ মাসে ২০ শতকের পুকুরে মলা-পুঁটি চাষের আয় ও ব্যয়ের হিসাব –

খাত	মলা		পুঁটি	
	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
ব্যয়				
পুকুর সংস্কার মজুরী		৩০০		৩০০
চুন	২০ কেজি	৩০০	২০ কেজি	৩০০
গোবর	১৬০ কেজি	৮০	১৬০ কেজি	৮০
মাছের পোনা	৮০০০ টি	৪০০০	৮০০০ টি	৪০০০
খাদ্য	২২৫ কেজি ৭৫ কেজি	২৭০০ ১৫০০	৩৪০ কেজি ১১০ কেজি	৪০৮০ ২২০০
গোবর	১৬০ কেজি	৮০	১৬০ কেজি	৮০
বিবিধ	-	৫০০	-	
সর্বমোট ব্যয়			৯৪৬০	১১৫৪০
আয়	১২০ কেজি	১৪৪০০	১৬০ কেজি	১৬০০০

মিশ্রচাষে এক একর পুকুরে ৮-৯ মাসে রুই জাতীয় মাছের সাথে মলা ও পুঁটি চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব -

খাত		মিশ্রচাষ
	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
ব্যয়	ইজারা মূল্য	২০০০০
	পুকুর সংস্কার মজুরী	২০০০
চুন	১০০ কেজি	১৫০০
গোবর	৮০০ কেজি	৪০০
মাছের পোনা	২৪০০০ টি	১৮০০০
খাদ্য চালের কুড়া সরিষার খৈল	৪৫০০ কেজি ১১০০ কেজি	৫৪০০০ ২২০০০
সার ইউরিয়া টিএসপি গোবর	১৬০ কেজি ৮০ কেজি ৬৪০০ কেজি	১২৮০ ৩৬০০ ৩২০০
বিবিধ		২০০০
সর্বমোট ব্যয়		১২৭৯৮০
আয় মাছ বিক্রয়: রুইজাতীয় মাছ- ১৬০০ কেজি (@ ৮০ টাকা)		২০৮০০০

মলা ও পুঁটি- ৮০০ কেজি (@ ১০০ টাকা)		
প্রকৃত মুনাফা		৮০০২০

মাছের রোগ-বালাই ও তার প্রতিকার

অন্যান্য জীবের ন্যায় ছোট মাছও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। পুকুরের মাছ সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, পরজীবি ইত্যাদি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়া অপুষ্টি ও খাদ্যের অভাব, অক্সিজেনের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে মাছের রোগ হয়। মাছের ক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম পন্থা। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে পুকুর প্রস্তুতি সঠিকবাবে করতে হবে। অন্য পুকুরে ব্যবহৃত জাল শোধন ব্যতীত পুকুরে ব্যবহার করা উচিত নয়। তাছাড়া শীতের শুরুতে (ভাদ্র-আশ্বিণ) পুকুরের প্রতি শতক জলায়তনে ২৫০ গ্রাম চুন ও ২৫০ গ্রাম লবণ প্রতি সপ্তাহে একবার করে ৪-৬ সপ্তাহ প্রয়োগ করলে মাছ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

রুইজাতীয় মাছের সাথে বাটা মাছের মিশ্রচাষ

বাংলাদেশের ছোট মাছগুলোর মধ্যে বাটা অন্যতম। রূপালি আঁশের এ মাছের দেহ লম্বা ও সরু, পিঠের দিকটা সামান্য কালচে রংয়ের হয়। বাটা জলাশয়ের নিচের স্তরে বাস করে এবং তলদেশের পঁচা উদ্ভিদ, প্রাণিকণা, শেওলা, বেনথোস ইত্যাদি খায়। বাটা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি, তবে এরা বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। বর্তমানে কার্প হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে বাটার পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে।

চাষের সুবিধা/গুরুত্ব

- বাটা অন্যান্য রুইজাতীয় মাছের সাথে একত্রে চাষ করা যায়;
- ছোট-বড় সব ধরণের জলাশয়েই বাটা মাছ চাষ করা যায়;
- বাজার মূল্য অনেক বেশি এবং রুইজাতীয় অন্যান্য মাছের তুলনায় বাটা ছোট অবস্থায় যে কোন সময় বাজারজাত করা যায়;
- প্রনোদিত প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা সারা বছর পাওয়া যায়;
- এ মাছের পেশী চর্বিযুক্ত ও সুস্বাদু;
- বছরে দু'টি ফসল উৎপাদন করা যায়;

চাষ পদ্ধতি

পুকুর প্রস্তুতি

- শুকনো মৌসুমে পুকুর থেকে জলজ আগাছা পরিষ্কার ও পাড় মেরামত করতে হবে;
- ছোট মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর শুকানো উচিত নয়। তাই বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ ও ক্ষতিকর প্রাণী অপসারণ করতে হবে;
- প্রতি শতকে ১-২ কেজি পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। মাটির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে চুনের মাত্রা কম-বেশি হতে পারে;
- পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমান প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানোর জন্য পোনা ছাড়ার পূর্বে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতকে ৪-৬ কেজি গোবর, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসটি প্রয়োগ করা ভাল;
- পানির রং সবুজ/বাদামী সবুজ হলে পুকুর পোনা ছাড়ার উপযুক্ত হয়।

পোনা মজুদ

পুকুরে মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে ভালো জাতের সুস্থ, সবল ও সঠিক প্রজাতির পোনা সঠিক সংখ্যায় মজুদের ওপর। পুকুরে পোনা ছাড়ার আগে ১০ লিটার পানি ও ১ চামচ (৫ গ্রাম) পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট দ্রবণ অথবা ১০০ গ্রাম লবণ দ্রবণে গোছল করিয়ে পোনা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। মিশ্র চাষের পুকুরে প্রতি শতকে পোনা মজুদের হার নিম্নরূপঃ-

প্রজাতি	সংখ্যা	আকার (সেমি.)
সিলভার কার্প	১২	১০-১৫
রুই	৬	১০-১৫
গ্রাসকার্প	২	১০-১৫
বাটা	৫০	৫-৭
মোট	৭০	

মজুদ পরবর্তী পরিচর্যা

- পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমান প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য দৈনিক বা ৭ দিন পর পর নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হয়;
- সাধারণ নিয়ম অনুসারে দৈনিক প্রতি শতকে ১৫০ গ্রাম গোবর অথবা ৩০০ গ্রাম কম্পোস্ট, ৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫ গ্রাম টিএসপি একটি পাত্রে পানির সাথে ১ দিন ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকাল ১০/১১টায় সারা পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে;
- জৈব ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে পরিমাণমত ও নিয়মিত ব্যবহার করলে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়।

সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ

- কার্প-বাটা মিশ্র চাষে সম্পুরক খাবার হিসাবে ১: ২ অনুপাতে সরিষার খৈল ও গমের ভুসি বা চালের মিহি কুঁড়া ব্যবহার করা যায়;
- ১০-১২ ঘন্টা ভিজানো সরিষার খৈলের সাথে শুকনো গমের ভুসি বা চালের মিহি কুঁড়া মিশিয়ে গোলাকার বল তৈরি করতে হবে;
- পুকুরে পোনা মজুদের প্রথম দু'মাস মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের শতকার ৫ ভাগ হিসাবে দৈনিক খাবার দিতে হবে;
- দু'মাস পর হতে মাছের ওজনের শতকরা ৩ ভাগ হিসাবে খাবার দিলেই চলবে;
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ শতকরা ১-২ ভাগ হিসাবে সরবরাহ করতে হবে;
- হিসাবকৃত মোট খাবার দিনে ২ বার প্রয়োগ করা ভাল;
- মাছের মাসিক নমুনায়নের মাধ্যমে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

সতর্কতা:

- পুকুরের তলদেশে কাঁদা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস জমে থাকতে পারে। দড়ির সাথে লোহা বা মাটির কাঠি কিংবা ইট বেঁধে হররা তৈরি করে পুকুরের তল ঘেষে আস্তে আস্তে টেনে তলার গ্যাস বের করে দিতে হবে;
- প্রতি মাসে একবার কিছু মাছ ধরে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে;

আহরণ:

চাষির প্রয়োজনমাফিক মাছের আকার, বাজার দর ও চাহিদা অনুযায়ী পুকুর হতে মাছ আহরণ করা প্রয়োজন। আহরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (জাল, পরিমাপক যন্ত্র, ঝুঁড়ি, বরফ ইত্যাদি) ও পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আহরণ দু'ভাবে করা যায়-

আংশিক আহরণ:

পুকুরে মজুদকৃত পোনা ৫-৬ মাস প্রতিপালনের পর বাজারজাতকরণের উপযুক্ত বড় মাছগুলো ধরে ফেলতে হবে। যে কয়টি মাছ বিক্রি বা ধরা হবে, একই জাতের সমসংখ্যক বড় আকারের পোনা আবার পুকুরে ছাড়তে হবে। এতে একই পুকুর থেকে বেশি পরিমাণে উৎপাদন পাওয়া যায়।

চুড়ান্ত আহরণ:

বাজার দর এবং পরবর্তী ফসলের জন্য পোনা প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে চুড়ান্ত আহরণের সময়কাল ঠিক করতে হবে। মাছ আহরণের পর পুকুর প্রস্তুত করে পুনরায় মাছ চাষের উদ্যোগ নিতে হবে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব:

একটি ৩০ শতক আয়তনের পুকুরে ৬ মাসে কার্প-বাটা মিশ্র চাষের আয়-ব্যয় ও উৎপাদনের হিসাব নিচে দেখানো হলো।

ব্যয়:

ব্যয়ের বিবরণ	সংখ্যা/পরিমান	মূল্য (টাকা)
পুকুর মেরামত/সংস্কার	-	১০০০.০০
চুন	৩০ কেজি	৪৫০.০০
ইউরিয়া	৩০ কেজি	১৮০.০০
টিএসপি	৩০ কেজি	৬০০.০০
গোবর	৭৫০ কেজি	৭৫০.০০
পোনা	১৮০০ টি	১,৮০০.০০
চালের মিহি কুড়া	১০০০ কেজি	১০,০০০.০০
সরিষার খৈল	৬০০ কেজি	১২,০০০.০০
মাছ ধরা ও অন্যান্য	-	৩০০০.০০
মোট ব্যয়		**২৯৭৮০.০০**

উৎপাদন ও মুনাফা:

রুইজাতীয় ও বাটা মাছ উৎপাদন = ৭৫০ কেজি

গড় মূল্য প্রতি কেজি ৬০.০০ টাকা হিসেবে আয় = ৪৫,০০০.০০ টাকা

মুনাফা = (আয় - ব্যয়) = (৪৫,০০০.০০-২৯,৭৮০.০০) = ১৫,২২০.০০ টাকা।

ধানক্ষেতে ছোট মাছের চাষ

ভূমিকা

ভাত ও মাছ বাংলাদেশের জনগণের প্রধান খাদ্য। আর এ দু'টি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর চাষযোগ্য আবাদী জমি ও মাছ চাষের জলাশয়। প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যার ঘন বসতিপূর্ণ ছোট এ দেশে দু'টো সম্পদই অত্যন্ত সীমিত এবং দিন দিন তা আরো সীমিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের চাহিদাও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এখনো আমাদের দেশের অর্থনীতি, পুষ্টি এবং কর্মসংস্থানে মাছ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পুষ্টিবিদদের মতে গড়ে জনপ্রতি বছরে ১৮ কেজি মাছের প্রয়োজন কিন্তু বর্তমানে মাছ গ্রহণের পরিমাণ মাত্র ১৩.৫ কেজি। যা আমদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। কেবলমাত্র পুকুরে মাছ চাষের মাধ্যমে এ ব্যাপক চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় জমির বহুবিধ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে ধানক্ষেতে মাছ চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে প্রায় ৬.৯৯ মিলিয়ন একর ধানী জমিতে বছরে ৪-৬ মাস পানি থাকে যা ধানের সাথে মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগি। এসব জমিতে ধানের সঙ্গে মাছ ও চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

ধানক্ষেতে মাছচাষ একটি সমন্বিত চাষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে, অল্প শ্রমে এবং সহজ ব্যবস্থাপনায় একই জমিতে একই সঙ্গে বা পর্যায়ক্রমে একের অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব যা জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত

করে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধানক্ষেতে মাছ চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ধানের সঙ্গে মাছ চাষ করলে ধানের ফলন ১২-১৭% এবং খড়ের ফলন ১৪-২০% বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষকের আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে আমিষ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতিও পূরণ হয়।

ধানক্ষেতে ছোট মাছ চাষের গুরুত্ব

আমাদের দেশে পূর্বে ধানক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু ষাটের দশকের দিকে ধানের ফলন বাড়ানোর জন্য এ দেশে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ফলে এসব ধানী জমিতে মাছের প্রাপ্যতা দ্রুত কমতে থাকে এবং বর্তমানে নেই বললেই চলে। তথাপি এখনো আমাদের দেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য এসব ছোট মাছের ওপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ, তারা অপেক্ষাকৃত দামী ও বড় মাছ ক্রয়ে সমর্থ নয়। এসব ছোট মাছে আমিষের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও প্রয়োজনীয় খনিজ (Minarel) উপাদান রয়েছে যা স্বাস্থ্য রক্ষায় খুবই প্রয়োজন।

আমাদের দেশে প্রায় ১৫০টি বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে পুকুরের পাশাপাশি ধানক্ষেতেও এসব ছোট মাছের চাষ করে এ দেশের মানুষের অপুষ্টিজনিত রোগ বিশেষকরে রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করা অনেকাংশেই সম্ভব। বর্তমানে ১৬ টি প্রজাতির ছোট মাছ চাষের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে মলা, পুঁটি এবং চিংড়ি ধানক্ষেতে চাষের জন্য খুবই উপযোগি।

ধানক্ষেতে মাছ চাষের সুবিধা

- ধানের সাথে মাছচাষ করলে একই জমি থেকে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে মাছ পাওয়া যায়;
- মাছ ধানের অনিষ্টকারী পোকা-মাকড় খায় এবং ক্ষেতে আগাছা জন্মাতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে ধানের ফলন বেশি হয় এবং কীটনাশক ও নিড়ানী খরচ কম লাগে;
- মাছের বিষ্ঠা ক্ষেতের উর্বরতা বৃদ্ধিতে সার হিসেবে কাজ করে;
- পোনা ক্রয়ের খরচ ছাড়া তেমন বাড়তি পুঁজির প্রয়োজন হয় না;
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনায় জৈবিক পদ্ধতিতে বালাই দমনে মাছ কার্যকর ভূমিকা পালন করে;
- এ পদ্ধতির চাষ কার্যক্রমে খাদ্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

ধানক্ষেতে ছোট মাছ চাষ পদ্ধতি

জমির ধরণ অনুযায়ী সাধারণত ২ পদ্ধতিতে ধানক্ষেতে মাছ চাষ করা যায়। যেমন-

১। যুগপৎ পদ্ধতি (Simultaneous or Concurrent method)
২। পর্যায়ক্রম পদ্ধতি (Alternate or Rotation method)

যুগপৎ পদ্ধতি

যুগপৎ পদ্ধতিতে ধান ও মাছ একই জমিতে এক সঙ্গে চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ধান হচ্ছে মুখ্য ফসল এবং মাছ হচ্ছে অতিরিক্ত ফসল। মধ্যম ও নিচু জমিতে যেখানে ৪-৬ মাস পানি থাকে, সেখানে আমন ধানের সাথে মাছ চাষ করা যায়। আবার বোরো মৌসুমে যেসব জমি সেচ সুবিধার আওতাধীন সেসব জমিতেও এ পদ্ধতিতে ধানের সাথে মাছ চাষ করা যেতে পারে। এছাড়া উপকূলীয় ধানী জমিতে বর্ষাকালে ধানের সাথে ছোট মাছ ও চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

ক) এক ফসলা পদ্ধতি
খ) দু'ফসলা পদ্ধতি

এক ফসলা পদ্ধতিতে মাছ ও ধান একই সঙ্গে একই জমিতে করা হয় এবং ধান কাটার পর মাছ ধরা হয়। আর দু'ফসলা পদ্ধতিতে একই মজুদের মাছকে পর পর দুই ফসলে রাখা হয়। অর্থাৎ প্রথম ফসলটি কাটার পর মাছকে ক্ষেতের এক প্রান্তের গর্তে বা মিনি পুকুরে রেখে দেয়া হয়। অতঃপর পরবর্তী ফসলে আবার ক্ষেতে ছাড়া হয় এবং দ্বিতীয় ফসল কাটার পর মাছ ধরা হয়।

এ পদ্ধতির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ

- এ পদ্ধতিতে এক সঙ্গে অল্প শ্রম ও স্বল্প খরচে দু'টি ফসল পাওয়া যায়;
- মাছ ধানের অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ও আগাছা খেয়ে এদের উপদ্রব কমিয়ে দেয়। ফলে এর জন্য বাড়তি পুঁজির প্রয়োজন হয় না;
- মাছের বর্জ্য ক্ষেতে জৈবিক সার হিসাবে কাজ করে;
- মাছের চলাচলে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং পুষ্টি উপাদানসমূহ অধিকতর সহজলভ্য হয়;
- ধান চাষের খরচ কম হয়, ফলন বৃদ্ধি পায়, ফলে মুনাফাও বেশি হয়।

পর্যায়ক্রম পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে একই জমিতে ধান ও মাছ পর্যায়ক্রমে চাষ করা হয়। সাধারণত ধান কাটার পর মাছ চাষ করা হয় এবং মাছ আহরণের পর ধান চাষ করা হয়। যেসব নিচু জমি বর্ষাকালে প্লাবিত হয় এবং যেখানে কেবলমাত্র শীতকালে বোরো ধানের চাষ করা হয়, সেসব জমি এ পদ্ধতির জন্য উপযোগি। তাছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় যেখানে বর্ষাকালে লোনাপানির চিংড়ি চাষ করা যায় না সেসব জমিতেও চিংড়ির পরে ধানের চাষ করা যেতে পারে। বর্ষার সময় ধানের সাথে স্বাদু পানির চিংড়ি ও মাছের চাষ করা যেতে পারে।

পর্যায়ক্রম পদ্ধতির সুবিধা

- এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে ধান থাকে না বলে ধান ক্ষেতে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি রাখা যায়;
- মাছ চাষের জন্য যে সব সার প্রয়োগ করা হয় সেগুলোর অব্যবহৃত অংশ এবং মাছের বর্জ্য ধানের জন্য সার হিসেবে কাজ করে;
- ধানের পর মাছ চাষ করা হয় বলে পোকা-মাকড়ের জীবন চক্র ব্যাহত হয়। ফলে পরবর্তীতে ধানক্ষেতে পোকার আক্রমণ কম হয়;
- ধানের পরে মাছ চাষ করাতে জমিতে আগাছার উপদ্রব কমে যায় এবং জমির মাটি নরম থাকে বিধায় অল্প চাষে পরবর্তীতে ধানের চারা রোপন করা যায়;
- ধান কাটার পর ধান গাছের গোড়ার অংশ পানিতে পঁচে গিয়ে প্রচুর প্লাঙ্কটন জন্মায়, যা মাছের উৎকৃষ্ট খাদ্য;
- এসব জমির বেশিরভাগ বহুমালিকানাধীন হওয়ায় সমবায়ভিত্তিক বা সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সুবিধা রয়েছে।

ধানক্ষেতে ছোট মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

১। ধানক্ষেতে যুগপৎ পদ্ধতিতে ছোট মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

জমি নির্বাচন

জমি নির্বাচনের ওপর ধান ক্ষেতে মাছ চাষের সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই জমি নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা উচিত।

- জমিটি অপেক্ষাকৃত সমতল হওয়া উচিত যাতে জমিতে পানির গভীরতা সব জায়গায় সমান থাকে;
- জমিটি যেন বন্যায় প্লাবিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই জমি নির্বাচন করতে হবে। এজন্য মাঝারী উঁচু জমি মাছ চাষের উপযোগি;
- মাটির পানি ধারণক্ষমতা বেশি থাকতে হবে। এজন্য এঁটেল বা দো-আঁশ মাটি হলেই ভালো,
- জমিতে যেন ধান কাটা পর্যন্ত ৪-৬ মাস পানি থাকে;
- নির্বাচিত জমি গভীর নলকূপ বা স্থায়ী জলাধারের পাশে হওয়া উচিত, যাতে সহজেই জমিতে প্রয়োজন মত পানি দেওয়া যায়;

- জমিটি বাড়ীর যতটা সম্ভব কাছাকাছি হওয়া ভালো।

জমি প্রস্তুতকরণ

ধানী জমিকে মাছ চাষের জন্য মাছের বাস উপযোগি করে তৈরি করতে হবে। জমি যত ভালভাবে প্রস্তুত করা হবে তত বেশি ধান ও মাছের উৎপাদন পাওয়া যাবে। এজন্য জমি ভালভাবে চাষ দেওয়ার পর মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে যেন সর্বত্রই পানির গভীরতা সমান থাকে।

আইল নির্মাণ:

প্রয়োজনমত পানি ধরে রাখার জন্য জমির চারপাশে উঁচু ও শক্ত করে আইল বাঁধতে হবে। আইলের উচ্চতা ৫০ সেমি. এর ওপরে হলে ভালো এবং আইলের গোড়ার দিক অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হওয়া উচিত যেন পানির চাপে আইল সহজে ভেঙ্গে না যায়। তবে আইলের উচ্চতা এমন হওয়া উচিত যেন বন্যার পানিতে ক্ষেত তলিয়ে না যায়। বর্ষার সময় ক্ষেতের অতিরিক্ত পানি যাতে আইল উপচিয়ে বেরিয়ে না যায় তার জন্য আইলের উপরিভাগে পানি নির্গমন পথ থাকতে হবে এবং নির্গমন পথে তাঁর বা নাইলনের জাল দিতে হবে যেন পানির সঙ্গে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।

গর্ত ও নালা খনন

ধানক্ষেতে মাছের আশ্রয়স্থল হিসেবে নালা এবং গর্ত বা মিনি পুকুর অবশ্যই থাকতে হবে। নালা আইলের ভিতর জমির চারপাশে অথবা আড়াআড়িভাবে বা কোনাকুনিভাবে তৈরি করা যেতে পারে। জমির অপেক্ষাকৃত নিচু অংশে ১-২% এলাকা জুড়ে ৭৫-৯৫ সেমি গভীর করে গর্ত করতে হবে। গর্তের সঙ্গে নালার সংযোগ রাখতে হবে যাতে মাছ নালার মাধ্যমে সহজেই গর্ত থেকে ধানক্ষেতে এবং ক্ষেত থেকে গর্তে আসতে পারে। ছোট মাছ চাষের জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে ক্ষেতের ভিতরে বা বাইরে অপেক্ষাকৃত নিচু অংশে মিনি পুকুর করতে পারলে এবং পুকুর থেকে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে নালার সংযোগ থাকলে ভাল হয়।

জমিতে নালা ও গর্ত করার উদ্দেশ্য

- খরা ও শুষ্ক মৌসুমে ক্ষেতের পানি কমে গেলে অথবা পানির তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মাছ নালা/গর্তে/পুকুরে আশ্রয় নিতে পারে;
- ক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হলে পানি কমিয়ে মাছকে নালা বা গর্তে রেখে কীটনাশক প্রয়োগ করলে মাছের কোন ক্ষতি হয় না;
- মাছ ধরার সময় পানি কমিয়ে নালা বা গর্তে সমস্ত মাছ একত্রিত করে সহজেই ধরা যায়;
- বড় গর্ত বা মিনি পুকুর থাকলে দু’ফসলা পদ্ধতিতে ধানক্ষেতে মাছ চাষ করা সুবিধাজনক। এছাড়া ধান কাটার পরে গর্তে/পুকুরে মাছ রেখে বড় করা যায়। এতে আর্থিকভাবে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়।

সার প্রয়োগ

ধান ও মাছের উৎপাদন বেশি পেতে হলে ক্ষেতে প্রয়োজন মত সার প্রয়োগ করা উচিত। মাটির উর্বরতা ও ধানের জাতের তারতম্য অনুসারে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের জন্য প্রতি শতক জমিতে ৬০০-৭০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০০-৫০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০০-২৫০ গ্রাম এমপি সার দেওয়া যেতে পারে। টিএসপি ও এমপি সার জমি তৈরির সময় একবারই প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে অর্থাৎ ধান রোপনের ৩০-৩৫ দিন, ৪৫-৫০ দিন এবং ৬০-৬৫ দিন পরে প্রয়োগ করতে হয়। সঙ্গে ৬-১০ কেজি গোবর জমি তৈরির সময় দিলে ভাল হয়। গোবর সার প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম হলেও চলে।

ধানের জাত নির্বাচন ও চারা রোপন পদ্ধতি

ধানের সাথে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ধানের জাত নির্বাচনে নিম্ন বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে-

- যেসব ধান উচ্চ ফলনশীল এবং অধিক পানি সহ্য করতে পারে ও সহজে হেলে পড়েনা;
- যেসব ধানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং পোকার আক্রমণ কম হয়;

- সমুদ্র উপকুলীয় এলাকার জন্য নির্বাচিত ধানের লবণাক্ততা সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে;
- উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের মধ্যে বিআর-৩ (বিপ্লব), বিআর-১১ (মুক্তা) ও বিআর-১৪ (গাজী) অন্যতম।

ধানের সাথে মাছ চাষ করতে ধানের চারা সারিবদ্ধভাবে এবং সমান দূরত্বে লাগাতে হবে, যাতে মাছ ধানক্ষেতে সহজে চলাফেরা করতে পারে। চারা লাগানোর সময় গোছা থেকে গোছার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি. এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি. দিতে হবে। তবে জোড়া সারি পদ্ধতিতে ১৫ সেমি. ও ৩৫ সেমি দূরত্বে লাগালে ভাল হয়। এ পদ্ধতিতে দুই সারির মধ্যকার দূরত্ব ১৫ সেমি. করে এক জোড়া এবং এক জোড়া সারি থেকে অপর জোড়া সারির দূরত্ব ৩৫ সেমি. হতে হবে। এর ফলে মাছ সহজেই ধানক্ষেতে চলাচল করতে পারে ও প্রচুর সূর্যালোক পায়, মাছের খাদ্যের প্রাচুর্যতা বেড়ে যায় এবং ধান ও মাছের ফলন বেশি হয়।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন ও পোনা মজুদ

ধানক্ষেতে পানির গভীরতা কম থাকাতে পানির তাপমাত্রা এবং পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া ধানক্ষেতে অল্প সময়ের জন্য মাছ রাখা হয়, তাই এ পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য প্রজাতি নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

- নির্বাচিত মাছ দ্রুত বর্ধনশীল হতে হবে;
- কম গভীর পানিতে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারে এবং তাড়াতাড়ি বড় হয়;
- তাপমাত্রা ও পরিবেশের তারতম্য সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে;
- ধানের কোন ক্ষতি করে না।

এসব বিবেচনা করে এ পদ্ধতির জন্য মিরর কার্প, সরপুঁটি, মলা ও চিংড়ি নির্বাচন করা যেতে পারে। নিম্নে এসব প্রজাতির মিশ্র চাষের প্রতি শতকে মজুদ ঘনত্ব দেওয়া হলো।

নমুনা-১	নমুনা-২

প্রজাতি	সংখ্যা	প্রজাতি	সংখ্যা
মলা	৫০-৬০	মলা	৬০-৬৪
মিররকার্প	৬-৮	চিংড়ি	৩৬-৪০
সরপুঁটি	১০-১২		
মোট	৬৬-৮০	মোট	৯৬-১০৪

পোনার মজুদ ঘনত্ব সাধারণত পোনার আকার, প্রজাতি এবং ক্ষেতের উর্বরতার ওপর নির্ভর করে। যেহেতু এ পদ্ধতিতে মাছকে অল্প সময়ের জন্য রাখা হয় সেহেতু বড় আকারের পোনা ছাড়া উচিত। এজন্য পুঁটি ও মিরর কার্প পোনার আকার ৯ সেমি. এর ওপর হলে ভাল হয়। পানির তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য পোনা মারা যেতে পারে বিধায় পোনা ধানক্ষেতে ছাড়ার পূর্বে অবশ্যই খাপ খাইয়ে অর্থাৎ তাপমাত্রা সাম্যবস্থায় এনে পোনা ছাড়তে হবে। ধান লাগানোর ১৫-২০ দিন পর পোনা ছাড়া উচিত। ধান লাগানোর পর পর পোনা ছাড়লে মাছের চলাচলের কারণে ধানের চারা আলগা হয়ে উঠে যেতে পারে।

পানি সরবরাহ

মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ধানী জমিতে সব সময় কমপক্ষে ১৮ সেমি ওপরে পানি রাখা উচিত। তবে প্রথম দিকে পানির গভীরতা বেশি হওয়া উচিত নয়, কারণ এতে চারা গাছ গোছা নিতে পারে না। তাই প্রথম দেড় মাস পর্যন্ত ১২-২০ সেমি. পানি রাখতে হবে এবং এরপর ধীরে ধীরে পানির গভীরতা বাড়ানো যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগ

ধানের সাথে মাছ চাষের জন্য বাইরে থেকে খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে বেশি উৎপাদন পাওয়ার জন্য মাছের দেহের ওজনের ২-৩ শতাংশ হারে সরিষার খৈল ও চালের কুড়া ১:২ অনুপাতে প্রতিদিন গর্তে বা ধানক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে।

পোকা-মাকড় দমন

ধানক্ষেতে মাছ চাষ করলে সাধারণত পোকার আক্রমন তেমন হয় না। যদি কোন পোকার আক্রমন দেখা দেয় তাহলে ক্ষেতের পানি কমিয়ে মাছকে গর্ত বা নালার মধ্যে রেখে কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। কীটনাশক ব্যবহারের ৪-৫ দিন পর জমিতে পানি ভর্তি করলে মাছ গর্ত বা নালা থেকে ক্ষেতে বের হয়ে আসবে। এছাড়া ধানক্ষেতে গাছের ডাল অথবা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে পোকার আক্রমন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মাছ আহরণ

ধান কাটার পর পানি কমিয়ে ক্ষেত থেকে মাছ ধরতে হবে। তবে সকালের দিকে তাড়াতাড়ি ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরে ফেলা উচিত। এতে মাছ সতেজ থাকে ও বিক্রয় মূল্য বেশি হয়। ধানের সঙ্গে মাছ চাষ করলে প্রতি শতাংশে এক ফসলা পদ্ধতিতে ১.৩০-২.৬০ কেজি এবং দু'ফসলা পদ্ধতিতে ২.৪০-২.৮০ কেজি মাছের উৎপাদন পাওয়া যায়। আর মলা ও চিংড়ি চাষ করলে প্রতি শতাংশে এক ফসলা পদ্ধতিতে ০.০৬-০.০৭ কেজি মলা ও ০.৮৫-০.৯৫ কেজি চিংড়ি এবং দু'ফসলা পদ্ধতিতে ০.২৪-০.২৮ কেজি মলা ও ১.৩২-১.৪৭ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা যায়।

পর্যায়ক্রম পদ্ধতিতে ধানক্ষেতে মলার সাথে রুইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ ব্যবস্থাপনা

জমি নির্বাচন

এদেশে বহু নিচু জমি আছে যা বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানিতে প্লাবিত থাকায় ধানের চাষ করা যায় না, তাই কেবলমাত্র শুষ্ক মৌসমে বোরো ধানের চাষ করা হয়। এসব জমি এ পদ্ধতির জন্য খুবই উপযোগি। যে জমিটি নির্বাচন করা হবে তার চারপাশে উঁচু জায়গা বা উঁচু আইল থাকতে হবে যেন বন্যার পানিতে প্লাবিত না হয়।

জমি প্রস্তুতকরণ

নির্বাচিত জমির চারপাশে সাধারণত উঁচু পাড় বা আইল থাকে। যদি কোথাও পাড় ভাঙ্গা বা নিচু থাকে তাহলে উঁচু ও শক্ত করে আইল বাঁধতে হবে যেন অতি বৃষ্টি বা বন্যায় প্লাবিত না হয়। ক্ষেতের পানি বের হওয়ার পথে বাঁশের বানা দিতে হবে যাতে মজুদকৃত মাছ বের হয়ে যেতে না পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য প্লাস্টিকের পাইপের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পাইপের মুখে নাইলনের জাল বেঁধে দিতে হবে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও গর্ত খনন

বর্ষাকালে জমি পতিত থাকার ফলে বিভিন্ন ধরণের আগাছা জন্মায়। এ সমস্ত আগাছাগুলোকে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সাধারণত জমির নীচু অংশে আয়তন অনুসারে ২-৪ শতাংশ জায়গায় গর্ত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মাছ চলাচলের জন্য নালার প্রয়োজন হয় না। গর্তটি মাছের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাছ ধরতেও সুবিধা হয়। তাছাড়া বড় মাছ বিক্রি করার পর ছোট মাছগুলোকে গর্তে রেখে বড় করা যায়।

জমি তৈরি

জমির সমস্ত আগাছা সরিয়ে ফেলে ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমিতে শেষ চাষের সময় প্রতি শতাংশে ৪৫০-৫৫০ গ্রাম টিএপি এবং ২৫০-৩০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া ৬০০-৭০০ গ্রাম ইউরিয়া ধান লাগানোর পর সমান তিন কিস্তিতে অর্থাৎ ধান রোপনের ৩০-৩৫ দিন, ৪৫-৫০ দিন এবং ৬০-৬৫ দিন পরে প্রয়োগ করতে হবে।

ধানের জাত নির্বাচন ও রোপন

বোরো মৌসুমের জন্য সাধারণত উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানই উপযুক্ত। এজন্য বিআর-৩ (বিপ্লব), বিআর-১১ (মুক্তা) ও বিআর-১৪ (গাজী) প্রভৃতি জাতের ধান নির্বাচন করা যায়। ধানের চারা সারিবদ্ধভাবে এবং সমান দূরত্বে লাগাতে হবে। এজন্য গোছা থেকে গোছার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি. এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি. রাখতে হবে।

ধানক্ষেতের পরিচর্যা ও ধান কাটা

ধানের পরিচর্যার জন্য ক্ষেতের আগাছা, পোকা-মাকড় ও রোগবালাই দমন করতে হবে। ধানের ফলন বৃদ্ধির জন্য তিন কিস্তিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং জমিতে প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ধান কাটার সময় ধানের গোড়া একটু লম্বা রেখে কাটতে হবে। তাহলে পরবর্তীতে মাছ চাষের জন্য জমিতে পানি দিলে ধানের গোড়া পঁচে গিয়ে প্রচুর প্লাঙ্কটন জন্মাতে পারে যা মাছের উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মাছ চাষ

ধান কাটার পর মাছ চাষের জন্য জমির পানি নির্গমন পথে বাঁধ দিয়ে জমির পানির গভীরতা বাড়াতে হবে যাতে ধানের গোড়া তাড়াতাড়ি পঁচে গিয়ে মাছের খাদ্য উৎপন্ন হয়।

প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ঘনত্ব

এ পদ্ধতিতে ধান ও মাছ আলাদভাবে চাষ করা হয় বলে মাছ চাষের জন্য পানির গভীরতা বেশি রাখা হয়। এছাড়া মাছকে প্রায় ৬-৭ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ধান লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত ক্ষেতে রাখা যায়। তাই মলার সঙ্গে রুই, কাতলা, মৃগেল, মিরর কার্প ও সরপুঁটি মাছের পোনা একত্রে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি মজুদ ঘনত্বে চাষ করা যেতে পারে। এজন্য প্রতি শতকে ৬০-৬৫টি মলা, ৪-৫টি রুই, ৩-৪টি কাতলা, ২-৩টি মৃগেল, ৫-৬টি মিরর কার্প ও ১০-১২টি সরপুঁটি মজুদ করা যায়।

মাছের পরিচর্যা

মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পানিতে যেন প্রাকৃতিক খাদ্য বজায় থাকে তার জন্য প্রতি শতকে ১৫ দিন পরপর ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। তার সঙ্গে ১.০-১.৫ কেজি গোবর প্রয়োগ করতে পারলে ভাল হয়। অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য সম্পূরক খাদ্য হিসাবে চালের কুড়া/গমের ভুসি এবং সরিষার খৈল ২:১ অনুপাতে মাছের মোট ওজনের শতকরা ৩-৫ ভাগ হারে প্রয়োগ করতে হবে। মাছের খাবার ছোট বল আকারে নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে প্রয়োগ করা উচিত।

মাছ আহরণ

ধান লাগানোর জন্য জমির পানি অল্প অল্প করে কমিয়ে মাছ ধরে ফেলতে হবে। মাছ খুব ভোরে ধরলে মাছ সতেজ থাকে এবং দামও বেশি পাওয়া যায়। দিনে সুর্যের তাপে মাছ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, ফলে মাছের বাজার মূল্য কম হয়। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে ৬-৭ মাসের মধ্যে প্রতি শতকে ৬.২-৬.৭ কেজি মাছের উৎপাদন পাওয়া যায়।

ধানক্ষেতে ছোট মাছ চাষের সমস্যা

ধানক্ষেতে ছোট মাছ চাষে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন-

- বর্ষাকালে অতি বৃষ্টিতে ধানক্ষেতের পানি আইল উপচিয়ে বা বন্যায় প্লাবিত হয়ে মাছ বের হয়ে যেতে পারে;
- খরা বা অনাবৃষ্টিতে ক্ষেতের পানি শুকিয়ে মজুদকৃত পোনা মারা যেতে পারে;
- কাঁকড়া ও ইদুর ক্ষেতের আইলে গর্ত করার ফলে পানি বের হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া পানি কমে গেলে সাপ, ব্যাঙ, বক, শিয়াল ইত্যাদি সহজে মজুদকৃত পোনা খেয়ে ফেলতে পারে;
- ধানক্ষেতে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হলে কীটনাশক ব্যবহার করা মাছের জন্য ঝুকিপূর্ণ হয়ে থাকে;

- সহজে মাছ চুরি হয়ে যেতে পারে;
- ধানক্ষেতে মাছ চাষে জমির মালিক ও বর্গাচাষীর মধ্যে সমঝোতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা-১

চাষ সম্ভাবনা

বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় অসংখ্য পুকুর ও দীঘি রয়েছে, যেগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের উপযুক্ত এবং এসকল পুকুরে উন্নত সনাতন পদ্ধতি কিংবা আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায়। এ সকল পুকুরে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিজ্ঞান সম্মতভাবে কৈ, শিং ও মাগুরের চাষ করা সম্ভব। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে বাহ্যিকভাবে কৈ মাছের উৎপাদনশীলতা হেক্টর প্রতি ৬-৭ মেট্রিক টন এবং দেশী শিং ও মাগুরের উৎপাদনশীলতা ৫-৬ মেট্রিক টন।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছ আমাদের দেশে জনপ্রিয় ‘‘জিওল মাছ’’ হিসাবে পরিচিত। আবাসস্থল সংকোচন, পরিবেশগত বিপর্যয়, প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ ভরাট এবং খাল বিল পানিশূন্য হওয়ায় এ সকল মাছ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। অতীতে এসব দেশীয় প্রজাতির মাছের চাষ সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের বিষয়ে কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি। চাষ পদ্ধতিতে এসব মাছ অন্তর্ভূক্ত করে উৎপাদন বাড়ানো এখন সময়ের দাবী। উচ্চ বাজারমূল্য, ব্যাপক চাহিদা ও অত্যন্ত লাভজনক হওয়া সত্বেও পোনার অপ্রতুলতার কারণে এ সকল মাছের চাষ আশানুরূপ প্রসার লাভ করছে না। তদুপরি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এসকল মাছ চাষে চাষীগণ বেশ উৎসাহি হয়ে উঠেছেন। প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন কলা কৌশল সম্পর্কে তাত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসহ পরামর্শ প্রদান করতে পারলে এসকল মাছচাষ আরো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ লাভ করবে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কৈ, শিং ও মাগুরের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষাবাদ করা হচ্ছে যা উৎসাহজনক। কিন্তু এ সকল মাছের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনার ওপর মৎস্য চাষিদের সঠিক ধারণা না থাকায় চাষিরা কৈ, শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মূখিন হচ্ছে।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের গুরুত্ব

- কৈ, শিং ও মাগুর মাছের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি এবং খেতে খুবই সুস্বাদু;
- অসুস্থ ও রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য রোগীর পথ্য হিসেবে এ সকল মাছ সমাদৃত;
- অল্প স্থানে অধিক ঘনত্বে এ সকল মাছ চাষ করা যায় বিধায় স্বল্প সময়ে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব;
- অতিরিক্ত শ্বসন অঙ্গা থাকায় এ সকল মাছ বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, ফলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়;
- অন্যান্য মাছের তুলনায় এ সকল মাছের চাহিদা ও বাজার মূল্য অনেক বেশি;
- এ সকল মাছে কম রোগ বালাই দেখা দেয় ও অধিক সহনশীলতা সম্পন্ন;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এ সকল মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে;
- বাণিজ্যিকভাবে জিওল মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।
- আধা-নিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ ক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে;
- জিওল মাছ চাষ করে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের সুবিধা

- ছোট-বড় যে কোন ধরণের জলাশয়ে এমনকি চৌবাচ্চায় বা খাঁচাতেও এ সকল মাছের চাষ করা যায়;
- বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এ সকল মাছ চাষের অত্যন্ত উপযোগি;
- মৌসুমি পুকুর, বার্ষিক পুকুর, অগভীর জলাশয়েও এ সকল মাছ চাষ করা যায়;
- স্বল্প গভীরতা সম্পন্ন পুকুরে অধিক ঘনত্বে সহজেই চাষ করা যায়;
- বিরূপ পরিবেশের পানিতে এরা স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে;
- কৈ মাছ ও শিং মাছ একক চাষে এবং মাগুর মিশ্রচাষে চাষ উপযোগি;
- কৈ মাছ ৪ মাসে এবং শিং ও মাগুর মাছ ৭-৮ মাসে খাবার উপযোগি ও বাজারজাত করা যায়;

- কৈ, শিং ও মাগুর মাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়;
- শিং ও মাগুর মাছ রুইজাতীয় মাছের সাথে চাষ করেও অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা যায়;
- উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগে চাষ করলে এসকল মাছে রোগ হওয়া সম্ভাবনা কম থাকে;
- অধিক ঘনত্বের চাষের মাধ্যমে সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়;
- জীবিত অবস্থায় বাজারজাত করার সুযোগ থাকায় এসকল মাছের চাহিদা বেশি থাকে।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের চাষ পদ্ধতি

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের একক চাষ এখনও ব্যাপক প্রচলন হয় নাই। চাষির অভিজ্ঞতা ও আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এসকল মাছ দুইভাবে চাষ করা যেতে পারে। অন্য যেকোন মাছ চাষের সাথী ফসল হিসাবে কৈ, শিং বা মাগুরের যেকোন একটি নির্বাচন করা যেতে পারে। যেমন রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষের পুকুরে একর প্রতি ২০০০-৫০০০টি জিওল মাছের পোনা ছাড়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে এদের খাবারের বিষয়ে পৃথকভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ে না। রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষের অনুরূপ পাঙ্গাস মাছের সাথেও সাথী ফসল হিসাবে জিওল মাছের যে কোন একটি প্রজাতি চাষ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও এদের খাবারের বিষয়ে পৃথকভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ে না। বর্তমানে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং চাষিগণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় অনেক চাষি এসকল মাছ বিশেষ করে কৈ এবং শিং এর একক চাষ দেশের অনেক জায়গায় প্রসার লাভ করেছে। এসকল মাছের আধা-নিবিড় একক চাষের জন্য নিম্নেরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের পোনা সংগ্রহ ও প্রতিপালন

কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত আকারের পোনা সহজলভ্য নয় এবং পাওয়া গেলেও তুলনামূলকভাবে দাম বেশি। সেজন্য সময়মত উপযুক্ত আকারের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য ছোট আকারের পোনা সংগ্রহ করে কৈ, শিং ও মাগুর মাছের পোনা নার্সারি পুকুরে ২০-২১ দিন প্রতিপালনের পর চাষের পুকুরে মজুদ করা উত্তম। নার্সারি পুকুরে যখন কৈ মাছের পোনাগুলো ২.৫- ৩.০ সেমি. আকারের হয় তখন গড় ওজন করে পোনা মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করতে হয়। শিং মাছের পোনার বয়স নার্সারি পুকুরে ৩০-৪০ দিন হলে তা মজুদ পুকুরে স্থানান্তরের যোগ্য হয়। অন্যদিকে মাগুর মাছের পোনার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে এদের মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করতে হবে। যে কোন উৎস থেকে সংগ্রহ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। উৎসস্থল থেকে মজুদ পুকুরের দুরত্ব যতকম হয় বিশেষ করে কৈ মাছের পোনার মৃত্যু হার তত কম হবে। অধিক দুরত্বে পরিবহনের ক্ষেত্রে মৃত্যু হার বেশি হয়। পক্ষান্তরে শিং ও মাগুর মাছ তুলনামূলকভাবে বেশি দুরত্বে পরিবহন করা সহজ।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের পোনা পরিবহন রুই জাতীয় পোনা পরিবহনের মত হলেও একটু ভিন্নতা রয়েছে। তারা কাটাযুক্ত হওয়ায় বড় আকারের পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। শিং ও মাগুরের ছোট পোনা অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহন করাই উত্তম।

নার্সারি পুকুর প্রস্তুতিঃ

কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের জন্য ৩.০ হতে ৫.০ সেমি. আকারের পোনার অতন্ত্য উপযোগি। উল্লেখিত আকারের পোনা সহজে পাওয়া যায় না বিধায় নিজস্ব নার্সারীতে পোনা প্রতিপালন করে নেয়া যেতে পারে, ফলে সঠিক সময়ে সঠিক আকারের পোনা প্রাপ্তিতে যেমন সুবিধা হয় তেমনি খরচও পড়ে কম। এসব মাছের ১০০০০টি ধানী পোনা মজুদের জন্য ১০ শতকের একটি নার্সারি পুকুর নির্বাচন করা যেতে পারে। অন্যান্য মাছের ধানী পোনা প্রতিপালনের অনুরূপ নার্সারি পুকুর প্রস্তুত সম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য যথারীতি পুকুর সেচ প্রদান করে শুকিয়ে পরিমান মত চুন ও জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

নার্সারি পুকুরে খাদ্য প্রয়োগঃ

পুকুরে ধানী পোনা ছাড়ার পর হতে পোনার ওজনের ৩ ভাগের ১ ভাগ হারে দিনে ৩ বারে ভাল মানের নার্সারি খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। ধানী পোনা ছাড়ার ২৫-৩০ দিন চাষের পর প্রজাতি ভেদে পোনা ৩.০-৫.০ সেমি. আকারে পরিণত হয়।

মজুদ পুকুর নির্বাচনঃ

উচ্চ ঘনত্বে কৈ, শিং ও মাগুর মাছের পোনা মজুদের জন্য পুকুর নির্বাচন একটি গুরূত্বপূর্ণ বিষয়। সহজে পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশন করা যায় এবং তলদেশে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম এরূপ বেলে, বেলে-দোআঁশ মাটির পুকুর এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে। নিজস্ব উর্বরা শক্তি কম আছে এরূপ পুকুরের পানি দুষণ সমস্যা কম হয়ে থাকে। বিশেষ করে ধান ক্ষেতকে অগভীর জলাশয়ে রূপান্তর করে বর্তমানে যে মাছ চাষ করা হচ্ছে সে ধরণের জলাশয় নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে পুকুরটিতে যাতায়াত ব্যবস্থা উত্তম হতে হবে এবং পানিতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো ও বাতাস প্রবাহের জন্য খোলামেলা হতে হবে।

মজুদ পুকুর প্রস্তুতিঃ

অন্যান্য মাছ চাষের মতই পুকুর প্রস্তুত করতে হবে তবে এ সকল মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর শুকালে সবচেয়ে ভালো হয়, তবে পুকুর সেচ দিয়ে মৎস্য শূন্য করে নিলেও চলবে। শতকে ১-২ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে পুকুরের তলদেশের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শুকানো পুকুর হলে চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোনা মজুদঃ

এ কথা সত্য যে, চাষের উত্তম ফলাফল নির্ভর করে ভাল মানের বীজের ওপর। তবে কৌলিতাত্বিকভাবে বিশুদ্ধ পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য নিজের নার্সারি পুকুরে পোনা উৎপাদন না করলে পরিচিত বিশ্বস্থ নির্ভরযোগ্য পোনা উৎপাদনকারীর নিকট হতে পোনা সংগ্রহ করাই উত্তম। পোনা ছাড়ার ঘনত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে খামারীর মাছ চাষের অভিজ্ঞতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, মাছ চাষের আগ্রহ, পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ এবং সর্বোপরি চাষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর। বাণিজ্যিক ভাবে কৈ, শিং মাগুর মাছের একক চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতের ৪-৫ দিন পর নিম্ন হারে পোনা ছাড়া যেতে পারে।

কৈ মাছের একক মজুদ হার

চাষের প্রকৃতি	মজুদ ঘনত্ব (শতকে)	মন্তব্য
মডেল-১	২৫০-৩০০	
মডেল-২	৪০০-৫০০	পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকতে হবে

পুকুরের পানির প্রতিবেশ (Ecosystem) ভালো রাখার জন্য কৈ মাছের সাথে শতকে ২-৩ টি সিলভার কার্পের ৬"-৭" আকারের পোনা ছাড়া যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৈ মাছের সাথে সাথি ফসল হিসাবে প্রতি শতকে দেশী মাগুর ২০টি অথবা শিং ১০টি মজুদ করা যেতে পারে।

শিং মাছের মজুদ হার

চাষের প্রকৃতি	মজুদ ঘনত্ব (শতকে)	মন্তব্য
মডেল-১	৩০০-৪০০	

মডেল-২	৪০০-৫০০	পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকতে হবে
মডেল-৩	শিং ২০০টি + কৈ বা পাঙ্গাস ১০০টি	পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকতে হবে
মডেল-৪	শিং ৫০টি + রুই জাতীয় মাছ ৪০টি	

মাগুর মাছের মজুদ হার

চাষের প্রকৃতি	মজুদ ঘনত্ব (শতকে)	মন্তব্য
মডেল-১	১৫০-২০০	
মডেল-২	২৫০-৩০০	পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকতে হবে
মডেল-৩	মাগুর ১৫০টি + কৈ বা পাঙ্গাস ১০০টি	পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকতে হবে
মডেল-৪	মাগুর ৫০টি + রূই জাতীয় মাছ ৪০টি	

পোনা মজুদকালীন করণীয়ঃ

মজুদ কালীন সময়ে পোনার মৃত্যু হার কমানোর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

- পরিবহন জনিত কারণে পোনার শরীরে ক্ষত হতে পারে, সে জন্য পোনা ছাড়ার পূর্বে ১ পিপিএম হারে পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট পানিতে গোসল করিয়ে পোনা ছাড়তে হবে।
- যদি সম্ভব হয় পোনা ছাড়ার সময় থেকে ১০-১২ ঘন্টা পুকুরে হালকা পানির প্রবাহ রাখতে হবে।

পোনা ছাড়ার সময়ঃ

ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোন সময়ে পোনা ছাড়া যেতে পারে। তবে সকাল অথবা বিকালে পোনা ছাড়া উত্তম। দুপুরের রোদে, ভ্যাপসা আবহাওয়ায়, অবিরাম বৃষ্টির সময়ে পুকুরে পোনা না ছাড়াই উচিত। পুকুরে পোনা মজুদের পর ১-২ দিন পুকুরে পোনার মৃত্যু হার পর্যবেক্ষণ করা দরকার। পোনা মৃত্যু হার বেশি হলে সম পরিমাণ পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা-২

খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

মাছের অধিক উৎপাদন প্রাপ্তির জন্য ভালো বীজের অর্থাৎ পোনার যেমন প্রয়োজন তেমনই ভালোমানের খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান জরুরী। মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় খাদ্যে নির্ধারিত মাত্রায় সকল পুষ্টি উপাদান থাকা প্রয়োজন। মাছ তার দৈহিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যে পুকুরে প্রাপ্ত খাদ্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে মাছচাষ করতে গেলে মাছের মজুদ ঘনত্ব বাড়াতে হবে। কৈ মাছের এরূপ চাষের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর নির্ভর করে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব নয়। নিবিড় মাছচাষে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সুষম দানাদার খাদ্য প্রয়োগ আবশ্যক। সুষম খাবার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এছাড়া সুষম খাবার প্রয়োগে উৎপাদিত মাছের Condition Factor সমুন্নত থাকে।

খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের উৎসঃ

মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্ততে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের জন্য বিভিন্ন ধরণের খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাদ্যের এ সকল উপকরণ প্রধানতঃ প্রাণিজাত এবং উদ্ভিদজাত উৎস থেকে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মাছের খাদ্য প্রস্ততে বহুলভাবে ব্যবহৃত চালের মিহিকুড়া, গমের ভুসি, চালের খুদ, আটা, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, সোয়াবিন মিল, ভুট্টা চূর্ণ প্রভৃতি উদ্ভিদজাত এবং ফিশমিল, Meat and Bonemeal গবাদিপশুর রক্ত ইত্যাদি প্রাণিজাত উপকরণ। মাছের দেহ বৃদ্ধির জন্য আমিষের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাছের খাদ্যে আমিষের পাশাপাশি পরিমাণমত শর্করা, চর্বি বা ফ্যাট, Vitamin ও খনিজজাতীয় পুষ্টি উপাদান পরিমাণ মত অবশ্যই থাকতে হবে। সাধারণত কৈ, মাগুর মাছের খাদ্যে ৩০-৩৫% আমিষ থাকা প্রয়োজন। কারণ এসকল মাছ প্রাণীজ আমিষ উৎসজাত খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত। সচরাচর ব্যবহৃত কিছু খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান নিচের সারণীতে দেয়া হলো :-

উপাদান	পুষ্টিমান		
	আমিষ	শর্করা	চর্বি
চালের কুঁড়া	১১.৮৮	৪৪.৪২	১০.৪৫
গমের ভুসি	১৪.৫৭	৬৬.৩৬	৪.৪৩
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	৩৪.৩৮	১৩.৪৪
তিলের খৈল	২৭.২০	৫৪.৯৭	১৩.১৮
ফিশমিল-এ গেড	৫৬.৬১	৩.৭৪	১১.২২
ব্লাড মিল	৬৩.১৫	১৫.৫৯	০.৫৬

খাদ্য উপকরণ নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়ঃ

আমাদের অধিকাংশ মৎস্য চাষি সম্পূরক খাবার হিসাবে প্রধানত সরিষার খৈল, চাউলের কুঁড়া ও গমের ভুসি ব্যবহার করে। এ ছাড়াও অনেক মাছচাষি এমন কিছু খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করেন, যেগুলো আর্থিক ভাবে লাভজনক নয়, এমনকি সেগুলো অনেক সময় পুকুরের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। যেমনঃ ধানের তুষ বা কুঁড়া মাছের ফুলকায় আটকিয়ে শ্বাসরোধ করে মাছের মৃত্যুর কারণ ঘটায়। খামারের নিজস্ব উদ্যোগে সম্পূরক খাদ্য প্রস্তত করলে প্রজাতিভিত্তিক খাদ্যের পুষ্টিগুণ বিচারে খাদ্য তৈরি করা উত্তম। পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের

উদ্দেশ্য হলো মাছের অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা। সে কারণে মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপকরণ নির্বাচনের সময় বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

- স্থানীয় ভাবে উপকরণসমূহের প্রাচুর্যতা
- উপকরণের পুষ্টিমান
- উপকরণের Comparative price
- মাছের খাদ্যাভ্যাস বা পুষ্টি চাহিদা
- চাষির আর্থিক সঙ্গতি
- উচ্চ খাদ্য পরিবর্তন হার
- উপকরণের আকার
- উপকরণ সংরক্ষণের মেয়াদ

খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ধারণঃ

খাদ্য প্রস্তুতির জন্য নির্বাচিত উপকরণসমূহের পুষ্টি উপাদান আমিষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। এ জন্য মাছের খাদ্য তৈরির সময় শুধুমাত্র আমিষের মাত্রা হিসাব করা হয়। মাছের খাদ্যে আমিষের মাত্রা নিরূপণের জন্য কৌনিক সমীকরণ পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। এই পদ্ধতিটি Pearsons Sqare Method (বর্গ পদ্ধতি) নামে পরিচিত।

পিয়ারসন্স বর্গ পদ্ধতিঃ

ধরা যাক, ফিসমিলে ৬০% ও চালের কূঁড়া ৮% আমিষ আছে। এ দুইটি উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি করতে হবে এবং প্রস্তুতকৃত খাদ্যে আমিষের মাত্রা হবে ৩০%।

- একটি বর্গ আকাতে হবে এবং প্রত্যাশিত আমিষের মাত্রা (৩০%) বর্গের মাঝখানে লিখতে হবে;
- বর্গের বাম পার্শ্বে দু'টি উপকরণের নাম তাদের আমিষের মাত্রাসহ লিখতে হবে;
- প্রত্যাশিত আমিষের মাত্রা থেকে উপকরণের আমিষের মাত্রা বিয়োগ করতে হবে;
- বিয়োগ ফল বর্গের উপকরণের বিপরীত কোণে অর্থাৎ বর্গের কর্ণের শেষে লিখতে হবে;
- বিয়োগ ফল ঋণাত্বক হলে তা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই;
- বর্গের ডানদিকে সংখ্যাগুলোকে যোগ করতে হবে;
- অতঃপর ডান দিকের যোগফল দিয়ে শতকরা হার বের করতে হবে।

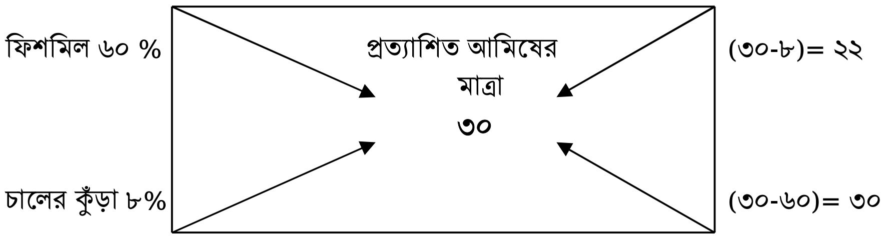

এখানে,

ফিশমিল = ২২/৫২ x১০০ = ৪২.৩১ অংশ
চালের কুঁড়া = ৩০/৫২x১০০ = ৫৭.৬৯ অংশ

অতএব, খাদ্য উপকরণের পরিমাণ

ফিশমিল = ৪২.৩১ গ্রাম
চালের কুঁড়া = ৫৭.৬৯ গ্রাম

পিয়ারসন্স পদ্ধতিতে খাদ্য সংমিশ্রণে গ্রাম/১০০ গ্রাম বা % ধরে করতে হয়।

মোট = ১০০ গ্রাম

এখন, প্রত্যাশিত আমিষের সঠিক আছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য নির্ণিত উপকণের সাথে তাদের নিজস্ব আমিষের মাত্রা/হার পূরণ দিয়ে যোগ করতে হবে।

ফিশমিল = ৪২.৩১x ০.৬০ = ২৫.৩৯ গ্রাম
চালের কুঁড়া = ৫৭.৬৯ x ০.০৮ = ৪.৬১ গ্রাম

মোট = ৩০ গ্রাম আমিষ

সম্পূরক খাদ্য তৈরীঃ

সে সকল দ্রব্য মাছকে খাওয়ানোর জন্য বাহির থেকে পুকুরে সরবরাহ করা হয়, যাহা মাছের ক্ষয়পূরণ, দৈহিক বৃদ্ধি সাধনে কাজ করে এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও প্রজনন সক্ষমতা লাভে সহায়ক ভুমিকা রাখে, সেসকল দ্রব্যকে মাছের সম্পুরক খাদ্য বলা হয়। সম্পুরক খাবার দুইভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে।

ক) বাণিজ্যিক খাদ্যঃ বর্তমানে বেসরকারি উদ্যোগে মাছের খাবার বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য বহু খাদ্য মিল স্থাপিত হয়েছে। এসকল কারখানায় মাছের বয়সের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মানের খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে। মাছ চাষিগণ তার চাহিদা অনুযায়ী বাজার থেকে বিভিন্ন পুষ্টিমানের ও দামের খাদ্য সংগ্রহ করে সহজেই পুকুরে প্রয়োগ করতে পারেন। কারখানায় প্রস্তুত পিলেট খাবার পানিতে সহজে গলে না, তাতে খাদ্যের অপচয় কম হয় এবং পানি সহজে নষ্ট হয় না। বাণিজ্যিকভাবে পিলেট খাবারে মাছের প্রজাতি বয়সভেদে পুষ্টি উপাদান আনুপাতিক হারে সংশ্লেষ থাকায় খাদ্য পরিবর্তন হার (Food Conversion Ratio) বেশি হয় অর্থাৎ তুলনামূলক **স্বল্প**খাদ্য প্রয়োগে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

খ) খামারে প্রস্তুতকৃত সম্পুরক খাদ্যঃ বাজারের পিলেট খাবারের পুষ্টিমান ঘোষণার সাথে সব সময় ঠিক থাকে না। মাছের বর্ধন ভাল পেতে হলে প্রয়োজনীয় খাদ্যে উপকরণসমূহ বাজার থেকে কিনে নিজস্ব পিলেট মেশিন দ্বারা খাদ্য তৈরি করা সবচেয়ে নিরাপদ। খামারে দুভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। বিভিন্ন ধরণের খাদ্য উপকরণ প্রয়োজন মাফিক একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিজ হাতেই খাদ্য প্রস্তুত করে পুকুরে প্রয়োগ করা যায় অথবা খাদ্য প্রস্তুত মেশিন এর সাহায্যে বিভিন্ন উপকরণ পরিমাণমত মিশিয়ে চাহিদা অণুযায়ী দানাদার সম্পুরক খাদ্য তৈরি করা যায়। খামারে প্রস্তুত সম্পুরক খাদ্য টাটকা (Fresh) হওয়ায় মাছের খাদ্য গ্রহণ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া খাবারে ছত্রাক, মোল্ড বা অন্যান্য পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে। কৃত্রিম দানাদার খাবারে ১০% এর অধিক জ্বলীয় অংশ থাকলে ছত্রাক বা মোল্ড দ্বারা সক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মাছের কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অধিকন্তু বানিজ্যিক মৎস্য চাষে ৭০-৭৫% ব্যয়ই খাদ্য খাতে হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কৈ, শিং ও মাগুর মাছের জন্য নিম্নহারে খাদ্যের উপকরণ মিশিয়ে স্বল্প মূল্যে কিন্তু ভালো মানের খাদ্য প্রস্তুত করা যেতে পারে।

ক্র. নং	উপকরণের বিবরণ	শতকরা হার		ক্র. নং	উপকরণের বিবরণ	শতকরা হার
১	ফিশমিল	২০		৫	গমের ভুসি	১২
২	সোয়বিন চূর্ণ	৮		৬	চিটাগুড়/রাব	৫
৩	অটোকুড়া	৩০		৭	সরিষার খৈল	২০
৪	ভুট্টাচূর্ণ	৫		৮	বিটামিন প্রিমিক্স	১ গ্রাম/কেজি

খাদ্য প্রস্তুতের ২৪ খন্টা পূর্বেই সরিষার খৈল পরিমাণমত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। অতপর অন্য সকল উপকরণের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে এমন ভাবে পানি মিশাতে হবে যেন খাবার অনেকটা শুকনা খাবারের মত হয়।

পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রাঃ

মাছের খাদ্য গ্রহণ মাত্রা নির্ভর করে পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলীর অনুকূল অবস্থার ওপর। তাপমাত্রা বাড়লে মাছের বিপাকীয় কার্যক্রমের হার বেড়ে যায়। ফলে খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে পানির তাপমাত্রা কমে গেলে খাদ্য চাহিদাও কমে যায়। মাছের খাদ্য গ্রহণ ও বিপাকের জন্য তাপমাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। যেমনঃ প্রতি তাপমাত্রা ১০°সে. বৃদ্ধির সাথে মাছের খাদ্য গ্রহণ মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তদ্রূপ পানির তাপমাত্রা পানির ১০°সে. কমে গেলে মাছের খাদ্য গ্রহণ স্পৃহা অর্ধেকে নেমে আসে। পিএইচ ৭.০-৮.৫ ও পানিতে দ্রবিভূত অক্সিজেনের মাত্রা বাড়লে মাছের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তা'ছাড়া ছোট অবস্থায় মাছ তুলনামূলক বেশি খাবার গ্রহণ করে থাকে।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছের দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা

মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
১-৩	১৫-২০
৪-১০	১২-১৫
১১-৫০	৮-১০
৫১-১০০	৫-৭
>১০১	৩-৫

নমুনায়ন ও খাদ্য সমন্বয়ঃ

নমুনাকরণের মাধ্যমে পুকুরের মোট মাছের জীবভর (Biomass) হিসাব করে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যেতে পারে এবং মজুদ মাছের ৫-১০% নমুনা সংগ্রহ করা উত্তম। ধৃত মাছের গড় ওজন হিসাব করে এবং মাছের বাঁচার হার ৯০% বিবেচনায় এনে মোট জীবভর নির্ণয় করতে হবে। কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের ক্ষেত্রে দৈনিক প্রয়োজনীয় খাবার সমান ৩ ভাগ করে সকাল, দুপুর ও বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। মাছের আকার ৩০ গ্রাম হলে মোট খাদ্যকে দুই ভাগ করে সকাল ও বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর মাছের নমুনায়ন করে মাছের জীবভর পরিমাপ করে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা সমন্বয় করতে হবে।

পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

নিম্নরূপে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে

- সমস্ত পুকুরে সমান ভাবে ছিটিয়ে;
- নির্ধারিত স্থানে ;
- খাদ্যদানীতে প্রয়োগ করা। খাদ্যদানীর সংখ্যা পুকুরে মজুদকৃত মাছের সংখ্যা ও আকারের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করতে হবে।

পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের সময় নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অনুসরণ করা প্রয়োজনঃ-

- খাদ্য প্রয়োগের জন্য সুবিধামত যে কোন একটি বা দুটির মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। কারণ বিদ্যমান সকল পদ্ধতির কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে;
- খাদ্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে পরিমিত পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে;
- পানি অতিরিক্ত সবুজ বা দূষিত হয়ে পড়লে বা বৃষ্টি হলে খাদ্য দেয়া কমাতে হবে;

- মাছ যে কোন কারণে পিড়ন (Stress) অবস্থার সম্মূখীন সৃষ্টি হলে খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে বন্ধ করে দিতে হবে। অন্যথায় খাদ্য অপচয় হয়ে পরিবেশ বিনষ্ট করবে।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের পুকুরের পানি ব্যবস্থাপনাঃ

কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতিদিন নিয়মিত হারে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োগ করায় মাছের মলমুত্র এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট পানিতে পঁচে পানির নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থের উপস্থিতি বেড়ে যায় ফলে মাছ নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখিন হয়ে থাকে। অধিক পঁচনশীল জৈব দ্রব্য পুকুরে প্রয়োগ করাই সমীচীন। পুকুরে জৈব উপাদানের বৃদ্ধির কারণে প্ল্যাঙ্কটনিক ব্লুমের সৃষ্টি হতে পারে এবং এক পর্যায়ে প্ল্যাঙ্কটনের যথাযথ পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এবং প্ল্যাঙ্কটনের অপমৃত্যু ঘটায়, ফলশ্রুতিতে পুকুরের পানির সার্বিক পরিবেশের মারাত্বক বিপর্যয় ঘটে এবং মাছের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ পরিবেশে প্রথমে মাছের খাদ্য গ্রহণ হার কমে যায়, মাছের বৃদ্ধি থেমে যায় এবং এক পর্যায়ে বিপুল হারে মাছ মারা যায়। এরূপ পরিবেশ যাতে না হয় সেজন্যে পানির রং এর অবস্থা অনুযায়ী মাঝে মধ্যে পানি দেয়া যেতে পারে, অথবা পুকুর থেকে কিছু পানি বের করে দিয়ে পুনরায় পানি সংযোগ করা যেতে পারে। এসব মাছের চাষ নিরাপদ রাখার জন্য সময়ে সময়ে প্রতি শতকে ২৫০ গ্রাম হারে খাদ্য লবণ ও চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরের পানির পরিবেশ ভালো রাখার জন্য বর্তমানে বাজারে নানা ধরণের জিওলাইট ও অনুজীব নাশক পাওয়া যায়, যাহা প্রয়োগে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষে অন্যান্য ঝুঁকিঃ

এসব মাছ চাষে ঋতুভিত্তিক কিছু ঝুঁকি থাকে। তাই সঠিক ব্যবস্থাপনা না নিলে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি অনেক সময় সমস্ত চাষ ব্যবস্থা হুমকির সম্মূখে পড়তে পারে।

ক) বর্ষাকালীন ঝুঁকিঃ বর্ষাকালীন অতিবৃষ্টি বা বন্যায় পুকুরের পাঁড় ভেসে গিয়ে চাষকৃত মাছ বেরিয়ে যেতে পারে। হালকা গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে পরিপক্ক কৈ ও মাগুর মাছ পানির স্রোতের ওপর ভর করে পুকুরের পাড় বেয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে। এ কারণে পুকুরের পাড়ে চারিদিকে বাঁশের বানা বা বেড়া অথবা প্লাস্টিক নেটের সাহায্যে ১.৫ ফুট উচু করে বেষ্টনির ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) শুষ্ক মৌসুমের ঝুঁকিঃ শুষ্ক মৌসুমে পুকুরের পানি শুকিয়ে পানির গভীরতা কমে পানির ঘনত্ব বেড়ে মাছের দৈহিক বৃদ্ধি বাঁধা গ্রস্ত হতে পারে। এতে পানির তাপমাত্রা বেড়ে পানিতে দ্রবিভূত অক্সিজেন স্বল্পতার সৃষ্টি হতে পারে। পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানির গভীরতা বাড়িয়ে পুকুরের প্রতিবেশ সহায়ক করতে হবে।

গ) শীতকালীন ঝুঁকিঃ শীতে (১৫° সে: তাপের নীচে) বিশেষ করে কৈ মাছ চাষে রোগের প্রাদূর্ভাব বেশি হয়, সে জন্য শীতের ২-৩ মাস কৈ মাছ চাষ না করাই ভাল। তবে এ সময়ে মাছ বা পোনা সংরক্ষণের জন্য পানির তাপমাত্রা বাড়িয়ে রাখার নিমিত্ত প্রতি দিন ভোরে গভীর নলকূপ-এর পানি দেয়া যেতে পারে।

ঘ) ক্ষতিকর গ্যাস : খাদ্যের অবশিষ্টাংশ এবং মাছের মলমূত্রের কারণে পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস জমে বুদবুদের সৃষ্টি করতে পারে এবং পানিতে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হতে পারে। পুকুরের তলদেশে জমে থাকা ক্ষতিকর গ্যাস অপসারণের জন্য ২-৩ দিন পর পর দুপুরের সময় পানিতে নেমে তলদেশ আলোড়িত করার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজটি হরস্থা টেনেও করা যায়। এক্ষেত্রে শতকে ২৫০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষতিকর গ্যাসের উপস্থিতির সমস্যা প্রকট আকাররূপে দেখা দিলে জিওনেক্স প্রয়োগে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

ঙ) মাছ চুরিঃ এটা একটি সাধারণ সমস্যা বা সামাজিক ঝুঁকি। পুকুরের মাছ বড় হলে এ ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই বড় মাছগুলো আহরণ করলে চুরি হওয়ার সম্বাবনা কমে যায়। এ ছাড়াও মাছ চাষিকে সমাজের অন্যদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব এড়াতে হবে। উৎপাদিত মাছ থেকে পুকুরের পার্শ্বে বসবাসকারীদের সৌজন্যমূলক কিছু মাছ বিতরণ করা যেতে পারে।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণঃ

মাছ আহরণঃ মাছ চাষের পদ্ধতি সঠিকভাবে পরিচালিত হলে প্রজাতি ভেদে চাষের ১০০-১৪০ দিনে মাছ বাজারজাত করণের উপযোগি হয় এবং এসময়ে মাছের গড় ওজন ৪০-১১০ গ্রাম হয়ে থাকে। মাছের আকার, ওজন, মাছের বাজার দর, চুরিসহ অন্যান্য ঝুঁকি এবং বিশেষ করে পুকুরে মাছের ধারণক্ষমতা (Carrying Capacity) বিবেচনায় রেখে মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাজারজাতকরণের নিমিত্ত আহরিত মাছের গুণগত মান অধিক সময় ভালো রাখার জন্য মাছ ধরার ১ দিন পূর্বে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখা উচিত। মাছ চাষের পুকুরে অধিক ঘনত্বে মাছ থাকলে মাছ বাজারজাতকরণের পূর্বের দিন জাল টেনে মাছ ধরে ছেড়ে দিতে হবে, এর ফলে বাজারজাত করার সময় মাছের মৃত্যু হার কমে যাবে।

মাছের বাজার দরঃ মাছের বাজার দর বিভিন্ন এলাকায় ও ঋতুতে কম বেশি হয়ে থাকে। বাজার চাহিদা ও মূল্যের প্রতি খেয়াল রেখে মাছ বাজারজাত করা উচিত। মাছের বাজার দর ভালো পাওয়ার জন্য মাছ ধরার আগেই দেশের বড় বাজারসমূহে সম্ভব হলে রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান বা মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় যোগাযোগ স্থাপন করে বাজার দর যাচাই এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জীবন্ত মাছ ছোট বড় বাছাই করে (Grading) বাজারসমূহে পাঠানোর ব্যবস্থ্া করা গেলে অধিক মূল্য পাওয়া যায়।

আহরণ পূর্বে করণীয় কাজঃ

মাছ আহরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিম্নে উল্লেখিত বিয়ষসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

- বাজার দর যাচাই;
- ক্রেতা নির্ধারণ;
- জেলে ও জালের ব্যবস্থা;
- পরিবহন ব্যবস্থা ;
- পুকুরে বিদ্যমান জলজ আগাছা ও ডালপালা (যদি থাকে) অপসারণ;
- মাছ পরিমাপের জন্য উপযুক্ত পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা;
- মাছ জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করার জন্য কন্টেনার (ড্রাম) এর ব্যবস্থা;
- মাছ আহরণ করে প্রাথমিক ভাবে জীবন্ত সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নেটের হাফা সংগ্রহ;
- মাছ প্যাকিং ও পরিবহনকালীন সংরক্ষণের জন্য পাত্র এবং বরফ সংগ্রহ ।

কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের আর্থিক বিশ্লেষণঃ

(ক) এক একরের একটি পুকুরে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে কৈ মাছ চাষে সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ-

ক্র. নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
ক) ব্যয়ের হিসাব		
১।	পুকুর সংস্কার/ভাড়া (৬ মাসের জন্য)	১০,০০০.০০
২।	কৈ মাছের পোনা ৪০,০০০টি (নার্সারিতে লালনের পর ৩০,০০০টি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য)	৬০,০০০.০০
৩।	সিলভার/কাতল ১৫০টি (৬-৭" আকারের)	১৫০০.০০
৪।	চুন ২৫০ কেজি	৪০০০.০০
৫।	মাছের খাদ্য (প্রায় ৩৫০০ কেজি; FCR=১.০০: ২.১৯)	৮৭,৫০০.০০
৬।	পারিবারিক শ্রম, শ্রমিক মজুরী, অন্যান্য	১০,০০০.০০
৭।	পরিবহন খরচ	১০,০০০.০০
মোট খরচ (ক)		**১,৮৩,০০০.০০**
খ) আয়ের হিসাব		
১।	কৈ মাছ বিক্রয় (বাঁচার হার ৮০% এবং ১৫টিতে কেজি ধরে এবং বাজার দর @ ১৫০/- হিসাব)	২,৪০,০০০.০০
২।	সিলভার/কাতল মাছ বিক্রয় ২০০ কেজি (প্রায়)	১১,০০০.০০

মোট আয় (খ)	**২,৫১,০০০.০০**
নিট লাভ =(খ-ক) = (২,৫১,০০০.০০ - ১,৮৩,০০০.০০)= ৬৮,০০০.০০ টাকা	

(খ) এক একরের একটি পুকুরে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে শিং মাছ চাষে সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ-

ক্র. নং	**বিবরণ**	**টাকার পরিমাণ**
ক) ব্যয়ের হিসাব		
১।	পুকুর সংস্কার/ভাড়া (৬ মাসের জন্য)	১০,০০০.০০
২।	শিং ও কৈ মাছের পোনা ৪০,০০০টি {নার্সারিতে লালনের পর ৩০,০০০টি (শিং ২০,০০০টি + কৈ ১০,০০০ টি) প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য	৭০,০০০.০০
৩।	সিলভার/কাতল ১০০টি (৬-৭" আকারের)	১,০০০.০০
৪।	চুন ২৫০ কেজি	৪,০০০.০০
৫।	মাছের খাদ্য (প্রায় ৩০০০ কেজি; FCR=১.০০: ২.৭৪)	৭৫,০০০.০০
৬।	পারিবারিক শ্রম, শ্রমিক মজুরী, অন্যান্য	২০,০০০.০০
৭।	পরিবহন খরচ	১০,০০০.০০
মোট খরচ (ক)		**১,৯০,০০০.০০**
খ) আয়ের হিসাব		
১।	শিং মাছ বিক্রয় (বাঁচার হার ৭০% এবং ২৫টিতে কেজি ধরে এবং বাজার দর @ ৩০০/- হিসাব)	১,৯৬,০০০.০০
২।	কৈ মাছ বিক্রয় (বাঁচার হার ৮০% এবং ১৫টিতে কেজি ধরে এবং বাজার দর @ ১৫০/- হিসাব)	৮০,০০০.০০
৩।	সিলভার/কাতলা মাছ বিক্রয় (১০০ কেজি)	৫,৫০০.০০
মোট আয় (খ)		**২,৮১,৫০০.০০**
নিট লাভ =(খ-ক) = (২,৮১,৫০০.০০ - ১,৯০,০০০.০০)= ৯১,৫০০.০০ টাকা		

(গ) এক একরের একটি পুকুরে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে মাগুর মাছ চাষে সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ-

ক্র. নং	**বিবরণ**	**টাকার পরিমাণ**
ক) ব্যয়ের হিসাব		
১।	পুকুর সংস্কার/ভাড়া (৬ মাসের জন্য)	১০,০০০.০০
২।	মাগুর মাছের পোনা ৩৫,০০০টি নার্সারিতে লালনের পর ২৫,০০০টি (মাগুর ১৫,০০০টি + কৈ ১০,০০০ টি) প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য	৫০,০০০.০০
৩।	সিলভার/কাতল ১০০টি (৬-৭" আকারের)	১,০০০.০০
৪।	চুন ২৫০ কেজি	৪,০০০.০০
৫।	মাছের খাদ্য (প্রায় ৩০০০ কেজি; FCR=১.০০: ২.৩৪)	৭৫,০০০.০০
৬।	পারিবারিক শ্রম, শ্রমিক মজুরী, অন্যান্য	২০,০০০.০০
৭।	পরিবহন খরচ	১০,০০০.০০
মোট খরচ (ক)		**১,৭০,০০০.০০**
খ) আয়ের হিসাব		
০১	মাগুর মাছ বিক্রয় (বাঁচার হার ৭০% এবং ১৪টিতে কেজি ধরে এবং বাজার দর @ ২০০/- হিসাব)	১,৩৭,৫০০.০০
০২	কৈ মাছ বিক্রয় (বাঁচার হার ৮০% এবং ১৫টিতে কেজি ধরে এবং বাজার দর @ ১৫০/- হিসাব)	৮০,০০০.০০
০৩	সিলভার/কাতল মাছ বিক্রয় (১০০ কেজি)	৫,৫০০.০০

মোট আয় (খ)	২,২৩,০০০.০০
নিট লাভ =(খ-ক) = (২,২৩,০০০.০০ - ১,৭০,০০০.০০) = ৫৩,০০০.০০ টাকা	

উপসংহারঃ

একবার কৈ, শিং ও মাগুর মাছ চাষের পর ঐ একই পুকুরে মাছ আহরণের পরপরই আবার এসকল মাছ চাষ করা উচিত নয়। এসব মাছ চাষের পর পর্যায়ক্রমে (Crop Rotation) অন্য মাছ যেমন তেলাপিয়া বা রূইজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ করা যেতে পারে। চাষের পুকুরের তলায় জমে থাকা কালো কাদা (Sludge) তুলে সব্জির ক্ষেতে, ফল বা ফুলের বাগানে দেয়া যেতে পারে। চীন দেশে Ecological Farming Concept-এ Sludge ব্যবহার করে সাথী ফসল হিসেবে সব্জী, ফুল ও ফল চাষে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। আমাদের দেশের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে এব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এছাড়া পরিশেগত উৎকর্ষতা বিধানেও তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কৈ, শিং ও মাগুর মাছ সু-স্বাদু জনপ্রিয় মাছ এবং এসব মাছের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বিদেশেও এসব মাছের চাহিদা প্রচুর এবং ইতোমধ্যে রপ্তানী শুরূ হয়েছে। মাছটি চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

পাবদা ও গুলশা মাছ বাংলাদেশের ছোট মাছগুলোর মধ্যে অন্যতম। মিঠাপানির এ মাছ দু'টি নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়ে একসময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে প্রজনন মাত্রা ও বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতা অনেক কমে গেছে। অত্যন্ত সুস্বাদু ও অত্যাধিক বাজার মূল্যের কারণে পাবদা ও গুলশা মাছ মৎস্যচাষীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ইতোমধ্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এদের পোনা উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং স্বল্প পরিসরে চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রুইজাতীয় মাছের সাথে পাবদা ও গুলশার মিশ্র চাষ

চাষের সুবিধা-

- মৌসুমী পুকুর, বার্ষিক পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে এ মাছ চাষ করা যায়;
- এ মাছ চাষে পুকুরের সব স্তরের খাবারের ব্যবহার নিশ্চিত হয়;
- ৫-৬ মাসের মধ্যেই কয়েক ধরণের রুইজাতীয় মাছের পাশাপাশি পাবদা ও গুলশা মাছ বাজারজাত করা যায়;
- শুধু রুইজাতীয় মাছ চাষের চেয়ে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়;
- পাবদা ও গুলশা মাছ সুস্বাদু, তাই বাজার মূল্য অনেক বেশি।

চাষ পদ্ধতি

পুকুর প্রস্তুতি-

- শুকনো মৌসুমে পুকুর থেকে জলজ আগাছা পরিষ্কার ও পাড় মেরামত করতে হবে;
- ছোট মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর শুকানো উচিত নয়। তাই বার বার ঘন ফাঁসের জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ ও ক্ষতিকর প্রাণি অপসারণ করতে হবে;
- প্রতি শতকে ১-২ কেজি পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। মাটির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে চুনের মাত্রা কম-বেশি হয়ে থাকে;
- পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানোর জন্য পোনা ছাড়ার পূর্বে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি শতকে ৪-৬ কেজি গোবর, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করা ভালো;
- পানির রং সবুজ/বাদামী সবুজ হলে পোনা ছাড়ার উপযুক্ত হয়।

পোনা মজুদ-

- পুকুরে মাছ চাষের সফলতা নির্ভর করে ভালো জাতের সুস্থ, সবল ও সঠিক প্রজাতির পোনা সঠিক সংখ্যায় মজুদের ওপর;
- পুকুরে পোনা ছাড়ার আগে পরিবহনকৃত পোনা পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে ১০ লিটার পানি ও ১ চামচ (৫ গ্রাম) পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট অথবা ১০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে তাতে ১-২ মিনিট গোসল করিয়ে পোনা জীবাণুমুক্ত করতে হবে;
- নিম্নের ছকে বর্ণিত যে কোন একটি নমুনা অনুযায়ী ১০-১২ সেমি. আকারের রুইজাতীয় মাছ ও ৫-৭ সেমি. আকারের পাবদা বা গুলশা মাছের সুস্থ সবল পোনা মজুদ করতে হবে।

কার্প-পাবদা মডেল - ১		কার্প-পাবদা মডেল - ২		কার্প-পাবদা-গুলশা মডেল

মাছের প্রজাতি	সংখ্যা	মাছের প্রজাতি	সংখ্যা	মাছের প্রজাতি	সংখ্যা
কাতলা	১২	সিলভার কার্প	৮	কাতলা	৮
রুই	৮	কাতলা	৪	রুই	১০
মৃগেল	৮	মৃগেল	৮	মৃগেল	১০
গ্রাসকার্প	২	গ্রাসকার্প	২	গ্রাসকার্প	২
পাবদা	৭০	সরপুটি	৮	পাবদা	৫০
-	-	পাবদা	৭০	গুলশা	৫০
মোট	১০০	মোট	১০০	মোট	১৩০

মজুদ পরবর্তী পরিচর্যা-

- পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য রাখার জন্য দৈনিক বা ৭ দিন পর পর নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হয়;
- সাধারণ নিয়ম অনুসারে দৈনিক শতক প্রতি ১৫০ গ্রাম গোবর অথবা ৩০০ গ্রাম কম্পোস্ট, ৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫ গ্রাম টিএসপি একটি পাত্রে পানির সাথে ১ দিন ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকাল ১০-১১টায় পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে;
- অথবা ৭ দিন/১০ দিন পর পর সার ব্যবহার করতে হলে উপরোক্ত পরিমাণে দিনের গুণিতক হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রতিদিন সার ব্যবহার করাই সর্বোৎকৃষ্ট;
- জৈব ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে পরিমাণ মত ও নিয়মিত ব্যবহার করলে বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়।

সম্পুরক খাদ্য সরবরাহ-

- কার্প-পাবদা-গুলশার মিশ্র চাষে সম্পূরক খাবার হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্যোপাদানের পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত হলো-

খাদ্যোপাদান	মিশ্রণের হার (শতকরা)
চালের মিহি কুড়া	৪০
গমের ভুসি	২০
সরিষার খৈল	২০
ফিশমিল	২০
মোট	১০০

- ১০-১২ ঘন্টা ভিজানো সরিষার খৈলের সাথে শুকনো গমের ভুসি বা চালের মিহি কুঁড়া মিশিয়ে গোলাকার বল তৈরি করতে হবে;
- পুকুরে মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের শতকরা ৫-৩ ভাগ হারে দৈনিক খাবার দিতে হবে;
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ শতকরা ১-২ ভাগ হারে সরবরাহ করতে হবে;
- বরাদ্দকৃত খাবার দিনে ২ বার প্রয়োগ করা ভাল;
- মাসিক নমুনায়নের মাধ্যমে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে;
- এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর বাণিজ্যিক পিলেট খাবারও মাছকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

সতর্কতা

- পুকুরের তলদেশে কাদা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস জমে থাকতে পারে। দড়ির সাথে লোহা বা মাটির কাঠি কিংবা ইট বেঁধে হররা তৈরি করে পুকুরের তল ঘেষে আস্তে আস্তে টেনে তলার গ্যাস বের করে দিতে হবে;
- প্রতি মাসে একবার কিছু মাছ ধরে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে;
- নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে;
- পুকুরে পানি কমে গেলে পানি সরবরাহ করতে হবে;

- পানি বেশি সবুজ হয়ে গেলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

আহরণ

আংশিক আহরণ-

রূইজাতীয় সব মাছ ও পাবদা-গুলশা মাছের বৃদ্ধির হার সমান নয়। বেশি লাভের জন্য বড় মাছ আহরণ করে ছোট মাছগুলোকে বড় হওয়ার সুযোগ করে দেয়া উচিত। তাই রূইজাতীয় যে মাছগুলো ৫০০-৭০০ গ্রামের উপরে হবে তা আহরণ করে সমসংখ্যক পোনা ছাড়তে হয়।

চুড়ান্ত আহরণ-

- বছর শেষে সব মাছ আহরণ করে ফেলতে হবে। বাজার দর এবং পরবর্তী ফসলের জন্য পোনা প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে চুড়ান্ত আহরণের সময়কাল ঠিক করতে হবে;
- পাবদা ও গুলশা মাছ ৮-৯ মাস চাষে যথাক্রমে ২৫-৩০ গ্রাম ও ৪৫-৫০ গ্রাম ওজনের হয় এবং তা বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত হয়।

সম্ভাব্য আয় ব্যয় :

৩০ শতক পুকুরে কার্প-পাবদা-গুলশা মিশ্র চাষের আয়-ব্যয় ও উৎপাদনের হিসাব নিচে দেখানো হলো।

বিবরণ		সংখ্যা/পরিমাণ	মূল্য
পুকুর মেরামত		-	১০০০.০০
চুন		৩০ কেজি	৪৫০.০০
ইউরিয়া		৩০ কেজি	১৮০.০০
টিএসপি		৩০ কেজি	৬০০.০০
গোবর		৭৫০ কেজি	৭৫০.০০
পোনা	রূইজাতীয় মাছের পোনা	৯০০ টি	৯০০.০০
	পাবদা/গুলশা	২১০০ টি	৬৩০০.০০
চালের মিহি কুড়া		৬০০ কেজি	৬,০০০.০০
গমের ভুসি		৩০০ কেজি	৪,৫০০.০০
সরিষার খৈল		৩০০ কেজি	৪,৫০০.০০
ফিশমিল		৩০০ কেজি	১২,০০০.০০
মাছ ধরা ও অন্যান্য		-	২,০০০.০০
মোট ব্যয়			**৩৯,১৮০.০০**

উৎপাদন

উৎপাদিত মাছ	**উৎপাদন (কেজি)**	**দর (টাকা)**	**বিক্রয়মূল্য (টাকা)**
রুইজাতীয় মাছ	৭০০ কেজি	৬০.০০	৪২,০০০.০০
পাবদা/গুলশা	৫৫ কেজি	২৫০.০০	১৩,৭৫০.০০
মোট উৎপাদন	**৭৫৫ কেজি**	**মোট আয়**	**৫৫,৭৫০.০০**

মুনাফাঃ মোট ব্যয় - মোট আয় = ৫৫,৭৫০.০০ - ৩৯,১৮০.০০ = ১৬,৫৭০.০০ টাকা

ছোট মাছ আহরণ, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

আহরণ

পুকুর বা জলাশয়ে উৎপাদিত মাছের আকার, ওজন, বাজার দর, বিভিন্ন ঝুঁকি এবং সর্বোপরি পুকুরে মাছের ধারণক্ষমতা (carrying capacity) বিবেচনায় রেখে মাছ আহরণ করা প্রয়োজন। প্রজাতি ভেদে ছোট মাছ আংশিক আহরণ (partial harvest) আবার অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আহরণ (total harvest) করা হয়। ছোট মাছ আহরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের জাল (যেমন- বেড় জাল, ধর্ম জাল, কৈ জাল, ঝাঁকি জাল ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ধরণের ফিশ ট্রাপ (কৈ ডুগাইর, খৈল সুন, ইচার চারি ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। ঠান্ডা ও পরিস্কার আবহাওয়ায় মাছ ধরা উচিত। বিশেষ করে নিকটবর্তী বাজারে পাঠানোর ক্ষেত্রে ভোরে এবং দুরবর্তী বাজারের জন্য মধ্যরাতে মাছ আহরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আংশিক আহরণ

চাষযোগ্য মলা, পুঁটি, চেলা ইত্যাদি মাছ অল্প সময়ের মধ্যে (২ মাস) প্রচুর পরিমাণে পোনা উৎপাদন করে। ফলে পুকুরে এসব মাছের ঘনত্ব অত্যাধিক বেড়ে যায়। এজন্য এসব মাছের আংশিক আহরণ অত্যাবশ্যক। মাছ ব্রুড হিসাবে মজুদের ২ মাস পর ১৫ দিন অন্তর অন্তর সুতি বেড় জাল অথবা ধর্ম জাল ব্যবহার করে আংশিক আহরণ করা প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ আহরণ

বাণিজ্যিকভাবে কতিপয় চাষযোগ্য ছোট মাছ যেমন কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা ইত্যাদি বেড় জাল দিয়ে পুরোপুরি আহরণ করা যায় না। তাই পুকুর শুকিয়ে এসব মাছ সম্পুর্ণ আহরণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মাছ আহরণ চাষির ইচ্ছার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। চাষির প্রয়োজন মাফিক অনেক ক্ষেত্রে বেড় জাল বা ঝাঁকি জাল ব্যবহার করে মাছ আংশিক আহরণ করা যায়।

বাজারজাতকরণ

মাছের বাজার দর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ও ঋতুভেদে কম বেশি হয়ে থাকে। লাভজনক দামের প্রতি খেয়াল রেখে মাছ বাজারজাত করা উচিত। মাছের বাজার দর অধিক পাওয়ার জন্য মাছ ধরার পূর্বেই দেশের বড় বাজারসমুহে যোগাযোগ স্থাপন করে বাজার দর যাচাই এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাজারে সম্ভব হলে প্রজাতিভেদে জীবন্ত অবস্থায় ও ছোট বড় আকারের মাছ আলাদা ভাবে বাছাই করে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জলাশয় থেকে আহরিত মাছ সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করা হয় না। বিক্রয় প্রক্রিয়া কতগুলো চ্যানেল বা ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে ভোক্তার কাছে পৌঁছে। ছোট মাছের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়না। এ ধাপগুলো হলো প্রাথমিক বাজার, দ্বিতীয় ধাপ বাজার এবং অবশেষে ভোক্তার ক্রয়ের জন্য সর্বশেষ বাজার ধাপ। তবে বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে কৈ, শিং, মাগুর ইত্যাদি মাছের উৎপাদন খামার হতে সরাসরি পাইকরি বাজারে অথবা রাজধানী শহরসহ বড় বড় শহরে বাজারজাত করা হচ্ছে। এতে উৎপাদনকারী অধিক লাভবান হচ্ছে।

পোনা মজুদের ৩-৪ মাসের মধ্যে কৈ মাছ ৮০-১০০ গ্রাম, শিং ৫০-৮০ গ্রাম ও মাগুর মাছ ১০০-১৫০ গ্রাম ওজনের হলে বাজারজাতকরনের জন্য উপযুক্ত হয়। এ সময় বাজার চাহিদা অনুযায়ী এসব মাছ আহরণ করে জীবন্ত অবস্থায় প্লাষ্টিক ড্রামে করে বাজারজাত করা যায়। সরপুঁটি ও বাটা মাছ ৩-৪ মাসের মধ্যে ১৫০-২০০ গ্রাম এবং গুলশা, পাবদা মাছ ৪০-৫০ গ্রাম ওজনের হলে বাজারজাত করা যায়।

মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- বাজার দর যাচাই করা;
- ক্রেতা নির্ধারণ করা;
- জেলে ও জাল ঠিক করা;

- পরিবহন ব্যবস্থা ঠিক করা;
- উপযুক্ত পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা;
- জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করার জন্য কন্টেইনার বা ড্রামের ব্যবস্থা করা;
- পরিবহনকালীন সংরক্ষণের জন্য পাত্র ও বরফের ব্যবস্থা করা;

ছোট মাছ আহরণের পর টাটকা রাখার পদ্ধতি

- মাছ আহরণের পর রোদে ফেলে রাখা উচিত নয়। কারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের গুণগতমান নষ্ট হতে থাকে;
- মাছ আহরণের পরপরই পরিষ্কার পানিতে ভালভাবে ধুয়ে মাছের দেহের উপরিভাগের স্লাইম বা পিচ্ছিল পদার্থ দূর করতে হবে। কারণ মাছের স্লাইমে পচনক্রিয়ায় সহায়ক জীবাণু থাকে;
- এরপর যত দ্রুত সম্ভব মাছকে বরফে সংরক্ষণ করলে দীর্ঘ সময় মাছ টাটকা থাকে। বরফে সংরক্ষণের সময় বরফ ভালভাবে চূর্ণ করে মাছের স্তরের উপরে ও নিচে বরফ দিতে হবে;
- মাছ পরিবহনের সময় ও দূরত্ব অনুসারে এমন পরিমান বরফ ব্যবহার করতে হবে যাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পরও মাছের গায়ে বরফ লেগে থাকে;
- পরিবহনের জন্য প্লাস্টিক ঝুড়ি বা বাক্স ব্যবহার করা ভাল। তবে বাঁশের ঝুড়ি বা কাঠের বাক্সও ব্যবহার করা যায়। ঝুড়ি বা বাক্সে মাছ রাখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে মাছের উপর বেশি চাপ না পড়ে। অধিক চাপে নিচের মাছ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে;
- পরিচর্যা এবং পরিবহনকালে মাছের মাংসপেশী যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

ছোট মাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

মাছ একটি দ্রুত পচনশীল দ্রব্য। তাই যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচর্যার ওপর এর গুণগতমান বা খাদ্যমান নির্ভর করে। মাছের মৃত্যুর পর পচনক্রিয়া শুরু হলে তা আর কোনভাবেই বন্ধ করা যায় না। তবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে মাছের পচনক্রিয়া বিলম্বিত করা যায় কিন্তু একেবারে বন্ধ করা যায় না। পচন থেকে মাছকে রক্ষার সবচেয়ে সহজ ও দ্রুততম পন্থা হচ্ছে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা। এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ের জন্য ছোট বা বড় সব ধরণের মাছই সংরক্ষণ করা যায়। বরফের সংস্পর্শে এসে মাছ দ্রুত ঠান্ডা হয় এবং পচনকারী ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার ব্যাহত হয়। ফলে মাছের পচন ক্রিয়া কমে যায়। বরফ দিয়ে সংরক্ষিত মাছ সহজে পরিবহন করা যায়।

ছোট মাছ সাধারণত তিন ভাবে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যায়। যথা:
ক) বরফজাতকরণ খ) শুটকিকরণ গ) সিঁদল করণ

ক) ছোট মাছ বরফজাতকরণ

- বরফ দ্বারা মাছ সংরক্ষণের পূর্বে মাছকে পানিতে ধুয়ে নিতে হবে;
- বাঁশের ঝুড়ি/চাটাই কিংবা হোগলা পাতার তৈরি টুকরিতে বরফ ও মাছ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। অনেকসময় ঝুড়ি বা বাক্সের ভিতরে চটের ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বরফ দ্বারা মাছ সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিক ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়। বাঁশের ঝুড়ি বা অন্যান্য প্রচলিত বাক্সের চেয়ে প্লাস্টিক ঝুড়ি ব্যবহার করা ভাল;
- ঋতুভেদে মাছে বরফ ব্যবহারের পরিমানে তারতম্য হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে মাছ ও বরফের অনুপাত ১:১ এবং শীতকালে ২:১ অনুপাতে ব্যবহার করা হয়। অনেকসময় সময় ও পরিবহন দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে বরফের পরিমান নির্ধারণ করা হয়;
- মাছে বরফ মেশানোর জন্য বরফ ব্লকগুলোকে গুড়ো করা হয়। বাক্সে নির্দিষ্ট পরিমান বরফ ও মাছ স্তরে স্তরে রাখার পর হোগলার মাদুর বা চটের টুকরা বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে সেলাই করে দেয়া হয়;
- সংরক্ষণের সময় প্রথমে ঝুড়ি বা পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ তারপর মাছ, আবার বরফ তারপর মাছ - এভাবে শেষ করে সবার উপর পুনরায় এক স্তর বরফ দিয়ে বাক্সের উপরিভাগ পলিথিন সীট বা হোগলার চাটাই দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে;

- বরফজাত পদ্ধতিতে মাছকে ৩-৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণে সর্তকতা

- বরফ তৈরিতে ব্যবহৃত পানি সব সময় দূষণমুক্ত হতে হবে;
- মাছ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত পাত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি পরিষ্কার রাখতে হবে;
- বরফে সংরক্ষণের জন্য সতেজ বা টাটকা মাছ ব্যবহার করতে হবে;
- একই প্রজাতি ও আকারের মাছ সংরক্ষণ করা উচিত;
- দূরবর্তী স্থানে পরিবহনের জন্য ফ্লেক আইস অথবা গুড়া বরফ ব্যবহার করতে হবে;
- বরফ ও মাছের অনুপাত সঠিক রাখতে হবে;
- পাত্রে বরফ ও মাছ এমনভাবে রাখতে হবে যাতে বরফ গলিত পানি ও মাছের ময়লা সহজেই পাত্রের নিচ দিয়ে চুইয়ে যেতে পারে;
- একই পাত্র বারবার ব্যবহার করলে ভালভাবে ধুয়ে ও শুকিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

খ) ছোট মাছ শুটকিকরণ

বাংলাদেশে সাধারণত শীত মৌসুমে সূর্যালোকে শুকিয়ে মাছ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা হয়। এ সময় আর্দ্রতা ও বৃষ্টি কম থাকে এবং সূর্যালোকের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য মাছ শুটকি করার জন্য পরিবেশ অনুকুল থাকে। ছোট মাছ সাধারণত নিম্নোক্ত দু'ভাবে শুটকি করা যায়।

১। প্রচলিত পদ্ধতি

প্রচলিত পদ্ধতিতে ছোট মাছ শুটকি করার সময় নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়ঃ-

- প্রথমে আহরিত মাছ পানি দ্বারা ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়া হয়;
- এরপর মাছগুলোকে পলিথিন সিট বা বাঁশের চাটাইয়ে বিছিয়ে উন্মক্ত স্থানে সুর্যালোকে শুকাতে দেয়া হয়;
- আবহাওয়া, মাছের আকার ও পুরূত্বের ওপর নির্ভর করে মাছ শুকাতে সাধারণত ৫-৭ দিন সময় লাগে;
- এভাবে শুকানো শুটকি মাছে সাধারণত ১০-১২% জলীয় অংশ থাকে।

২। পলিথিন তাঁবু বা সোলার টেন্ট ড্রায়ারে মাছ শুকানো

এটি সূর্যালোকে মাছ শুটকি করার একটি উন্নততর পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মাছ শুকানোর জন্য বাঁশের কাঠামো দিয়ে দু'চাল বিশিষ্ট ঘরের কাঠামো তৈরি করে তার ওপর পলিথিন সিট দিয়ে ঢেকে তাঁবুর আকার দেয়া হয়। তাঁবুর পেছনের দিকে ও মেঝেতে কালো পলিথিন থাকে এবং সূর্যের দিকে মুখ করা পাশে স্বচ্ছ পলিথিন থাকে। স্বচ্ছ পলিথিন ভেদ করে সূর্যরশ্মি তাঁবুতে প্রবেশ পথে এবং পেছনের কালো পলিথিনে সূর্যরশ্মি শোষিত ও বিকিরিত হয় ফলে তাঁবুর ভিতরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাঁবুর ওপরের দিকে ছিদ্র রাখা হয়, যে পথে জলীয় বাষ্প বের হয়ে যেতে পারে। নিচের দিকেও এক পাশে ছিদ্র রাখা হয়, যে পথে বাতাস প্রবেশ করতে পারে। মাছকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য তাবুর ভিতরে আনুভূমিকভাবে বাঁশের তাঁক স্থাপন করা হয়। সূর্যের আলোর তাপে তাঁবুর তাকে রক্ষিত মাছ থেকে পানির জলীয় বাষ্পাকারে ওপরের ছিদ্রসমূহ দিয়ে বের হয়ে যায়। এখানে তাপমাত্রা সাধারণত ৪৫-৫৫^{O}সে. এর মধ্যে থাকে, যা সূর্যের আলোর তাপমাত্রা থেকে অনেক বেশি। এ পদ্ধতিতে শুটকি করতে সাধারণত ৩-৫ দিন সময় লাগে।

মাছ শুকানোতে সর্তকতা

- মাছ শুকানোর সময় অবশ্যই টাটকা মাছ ব্যবহার করতে হবে;
- শুটকি তৈরির সময় ব্যবহার্য সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে ও পরে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কারকালে ক্লোরিন পানি ব্যবহার করা যেতে পারে;
- মাছ শুকানোর পূর্বে লবণ দ্রবণে চুবিয়ে নিলে শুকানোর সময় মাছি ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম হয়। এছাড়াও স্বচ্ছ পলিথিন বা জাল দিয়ে ঢেকে দিলে মাছি ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়;
- উন্মুক্তস্থানে শুটকি মাছ মজুদ বা গুদামজাত করা উচিত নয়।

শুটকি মাছ সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ

মাছ শুটকি করার পর সংরক্ষণকালে তার গুণাগুণ কেমন থাকবে তা নির্ভর করে গুদামজাতকরণের ওপর। শুটকি মাছ গুদামজাত করার সময় ছিদ্রহীন পলিথিন ব্যাগে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। তাছাড়া টিনের পাত্রেও শুটকি মাছ মজুদ করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে টিন যেন বায়ু নিরোধক হয়। শুটকি মাছ চটের বস্তায় মজুদ করা যায়। এক্ষেত্রে শুটকির বস্তা শুকনা ও পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে গুদামজাত করলে শুটকি মাছ অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

গ) ছোট মাছের সিঁদল শুটকি বা চ্যাপা শুটকি

সিদল শুটকি বা চ্যাপা শুটকি একটি ফারমেন্টেড মৎস্যজাত দ্রব্য। মাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অন্যান্য কৌশলের মত ফারমেন্টেশন একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল। কিছু কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে নিঃসৃত এনজাইম ও মাছের দেহের এনজাইম অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে মাছের রাসায়নিক গঠনে, বিশেষ করে প্রোটিনের পরিবর্তন করে সরল যৌগ উৎপন্ন করে ফলে মাছে ফারমেন্টেশন হয়। তবে সিঁদল শুটকির বেলায় আংশিক ফারমেন্টেশন করা হয়। পুঁটি মাছের সিঁদল শুটকি এদেশে ছোট মাছের একটি অতি পরিচিত মৎস্যজাত খাদ্য।

সিঁদল শুটকি উৎপাদন কৌশল

- প্রথমে মাছের নাড়ি-ভূঁড়ি বের করে পরিষ্কার পানিতে ভালভাবে ধুয়ে ৭-১০ দিন রোদে শুকানো হয়;
- মাছ শুকানোর পর মাটির কলসিতে (যা মটকা নামে পরিচিত) রাখা হয়;

  মটকা'র ভেতর ও বাইরর দিকে অন্য কোন মাছের তেল দিয়ে ভালভাবে প্রলেপ দিয়ে রোদে ভালভাবে শুকানো হয় যাতে মটকাতে রাখা মাছ থেকে তেল শোষন করতে না পারে;
- মটকায় মাছ রাখার আগে শুকানো মাছকে পুনরায় পানিতে ধুয়ে সারা রাত বাঁশের চালুনিতে রাখা হয় ফলে মাছের দেহ হতে পানি ঝরে যায়;
- পরের দিন পানিমুক্ত ঐ মাছ দিয়ে মটকা কানায় কানায় পূর্ণ করা হয়। বাঁশের লাঠির সাহায্যে ঠেসে ঠেসে মাছ ভরা হয় যাতে ভিতরে কোন ফাঁকা জায়গা না থাকে;
- মটকা মাছ দিয়ে ভরার পর পাত্রের মুখ ভেষজ কীটনাশক হিসাবে তেঁতুল পাতা/চা-বীজ গুঁড়া/কলা পাতা দিয়ে ভালভাবে বন্ধ করা হয় এবং তার উপর কাদার প্রলেপ দিয়ে অবায়বীয় অবস্থা বজায় রাখা হয়;
- এরপর মটকাটি গলা পর্যন্ত ৪-৬ মাস মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয় এবং ভাবে মটকা বা কলসির মধ্যে উৎপাদিত মৎস্যজাত দ্রব্যটিই হল সিঁদল শুটকি;
- কখনো কখনো মাটির নিচে পুঁতে রাখা মটকা ঠান্ডা রাখার জন্য মাটির উপর লাউ, কুমড়া, সিম প্রভৃতি গাছ লাগানো হয় যাতে পর্যাপ্ত ছায়া পাওয়া যায়;
- সিঁদল শুটকি ১ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়;

আহরিত মাছ সতেজ গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য আহরণের পরিচর্যা সঠিকভাবে করা উচিত। এরফলে মাছের ভাল বাজার মূল্য পাওয়া যায়। মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে একদিকে বেশি পুষ্টি সমৃদ্ধ মাছ পাবে। অন্যদিকে সারা বছরই বাজারে ছোট মাছের সরবরাহ থাকবে। এতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

DoF, 2005. Statistical Year Book 2005. Fisheries Resources Survey System, Department of Fisheries, Bangladesh.

Felts, R. A., Ahmed, K. and Akhteruzzaman, M. (eds.). 1997. Small Indigenous Fish Culture in Bangladesh. Proc. National Workshop on Small Indigenous Fish Culture in Bangladesh, Rajshahi University, Bangladesh, 156 p.

Felts, R. A., Rajts, F. and Akhteruzzaman, M. 1996. Small Indigenous Fish Species Culture in Bangladesh. IFADEP, Department of Fisheries, Bangladesh, 41 p.

Hoq, E. 2004. Bangladesher Chhoto Mach (A Book on Small Indigenous Fish Species of Bangladesh). Graphic Sign, Mymensingh, Bangladesh. 110 p.

IUCN, 2001. Red Book of Threatened Fishes of Bangladesh. IUCN-The World Conservation Union. 116 p.

Rahman, A. K. 2004. Freshwater Fishes of Bangladesh. Zoological Society of Bangladesh. Dhaka, Bangladesh, 364 p.

Wahab, M. A, Thilsted, S, H. and Hoq, M. E (eds.). 2003. Small Indigenous Species of Fish in Bangladesh. Proceedings of BAU-ENRECA/DANIDA Workshop on Potentials of Small Indigenous Species of Fish (SIS) in Aquaculture & Rice-Field Stocking for Improved Food & Nutrition Security in Bangladesh, 30-31 October 2002, BAU, Mymensingh, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh and ENRECA/DANIDA. 166 p.

ইসলাম, এম. এ. ও আলম, এম. এস. ১৯৯৬. মাৎস্য চাষ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, ১৭২ পৃষ্ঠা.

মজিদ, এম. এ.(সম্পাদনা). ২০০৫. দেশীয় ছোট ও বিপন্ন প্রজাতির মাছ চাষ ম্যানুয়েল। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়। ৮৮ পৃষ্ঠা.

মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৭. দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ সহায়িকা। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ছড়া ও বিলে মৎস্য উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ। ৪৮ পৃষ্ঠা.

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, ২০০৭. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালঃ মৌলিক মাছ চাষ বিষয়ক কোর্স, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ। ১৫৫ পৃষ্ঠা.

মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৫. স্মরণিকাঃ জাতীয় মৎস্য পক্ষ-২০০৫, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ। ১৩২ পৃষ্ঠা.

মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৫. সংকলনঃ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অভিযান ২০০৭, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ৯৫ পৃষ্ঠা.

মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০২. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ (সংশোধিত ১৯৮৫), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।

তথ্য মন্ত্রণালয়-বাংলাদেশ, ১৯৯৫. স্বাস্থ্য তথ্য। তথ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ইউনিসেফ/হু/ইউনেসকো/ইউনেসকো/ইউএনফিএ, বাংলাদেশ, ১০২ পৃষ্ঠা.